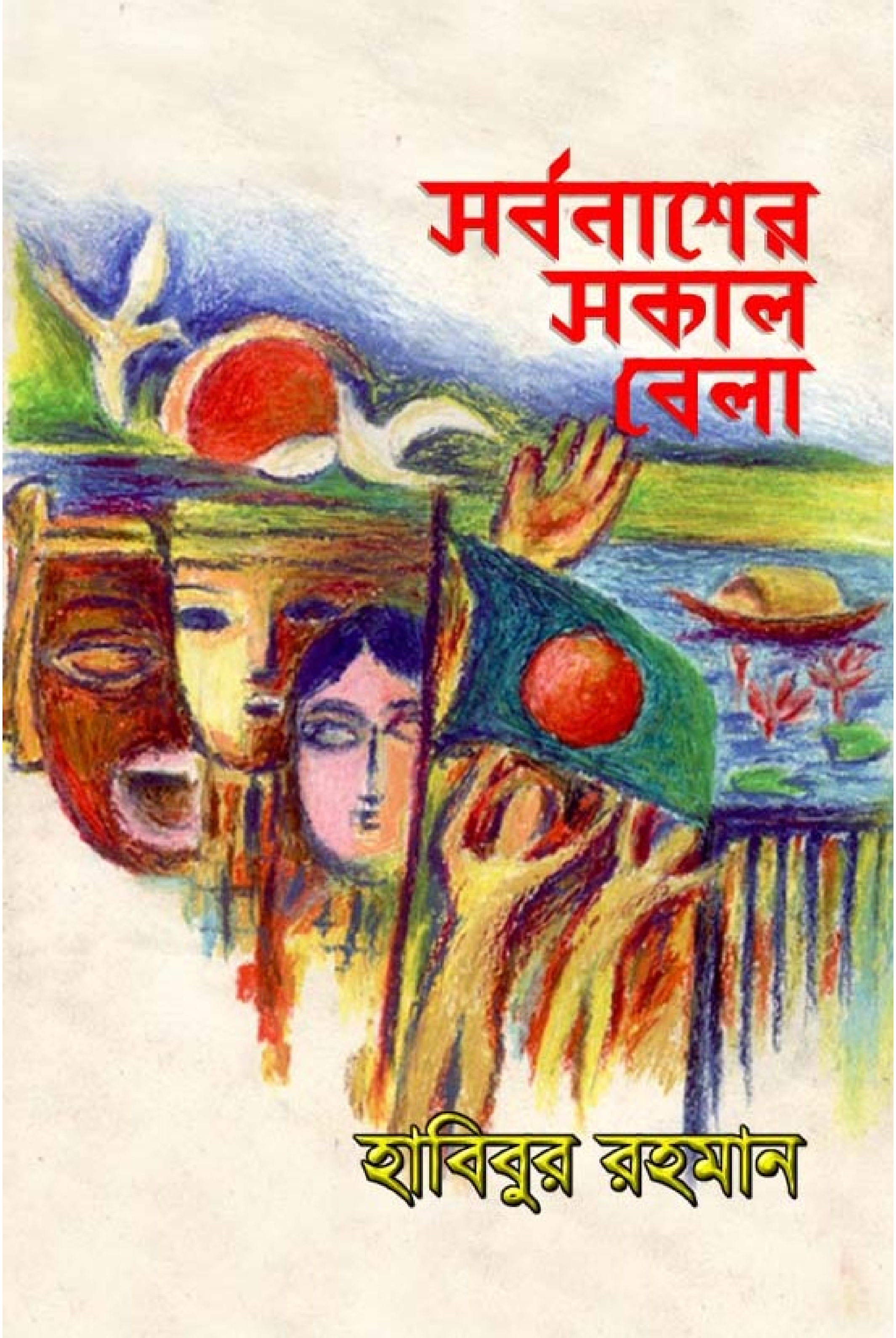
সর্বনাশের
সকাল
বেলা
হাবিবুর রহমান

লেখক পরিচিতি

হাবিবুর রহমান : কবি, গাল্পিক, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক। বাড়ী : ঢাকা জেলার দোহার থানার পালমগঞ্জ গ্রামে। জন্ম : ১৯৫৪ সনের ১০ই জানুয়ারী শরিয়তপুর জেলার পালং থানার ডোমসা গ্রাম মাতুলালয়ে। লেখালেখির শুরু স্কুল জীবনে। তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তানের ছোটদের আসরে। প্রথম প্রকাশিত কবিতা অধুনালুপ্ত দৈনিক স্বদেশে। প্রথম প্রকাশিত গল্প রবিবাসরীয় ইত্তেফাকে। সাপ্তাহিক জাগ্রত জনতার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। অধুনালুপ্ত দৈনিক গণকণ্ঠের কলাম লেখক, দৈনিক পূর্বাভাসে সাব এডিটর হিসাবে যোগদান। ষ্টাফরিপোর্টার হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন স্বদেশ ত্যাগ। বর্তমানে জেদ্দায় কর্মরত। জেদ্দার প্রধান সাহিত্য সাময়িকী বহুমাত্রিকের সম্পাদক। এছাড়া রণাঙ্গন'৭১, জনক ও অনির্বানের প্রধান সম্পাদক। আমরা লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী, সমস্বর ও কায়কোবাদ সাহিত্য মজলিশের সক্রিয় কর্মী ছিলেন ছাত্রাবস্থায়। বর্তমানে জেদ্দা লেখক গোষ্ঠীর সভাপতি। জেদ্দা ও রিয়াদ থেকে প্রকাশিত সাহিত্য সাময়িকী ও পত্র পত্রিকায় লিখে যাচ্ছেন। নিয়ত অন্বিষ্ট অন্বেষায় সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন এ কবির দায়বদ্ধতা শুধুই মানুষের কাছে।

সর্বনাশের সকাল বেলা

(নির্বাচিত গল্পগ্রন্থ)

হাবিবুর রহমান

প্রকাশক

দেওয়ান আব্দুল বাসেত
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
ঢাকা - বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশ

অমর একুশে বই মেলা ২০০৩

গ্রন্থস্বত্ত্ব

মাফরূহা রহমান স্বাতী

প্রচ্ছদ

আনোয়ার হোসেন শিপন

কম্পিউটার কম্পোজ

লুবনা বাসেত বৃষ্টি

ইন্টারনেট সংস্করণ

ডিসেম্বর : ২০০২

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স ঢাকা, বাংলাদেশ
জোনাল অফিস : রিয়াদ, সৌদী আরব
Email : marupalash@yahoo.com

Sorbanaser Sokal Bela

(A collection of short stories)

HABIBUR RAHMAN

PUBLISHED BY

Dewan Abdul Baset
Marupalash (Biopotro) Group of Publications
Dhaka, Bangladesh.

ZONAL OFFICE

Riyadh, Saudi Arabia

FIRST EDITION

February 2003
Marupalash Group Bangladesh

COVER DESIGN

Anwar Hossain Shipon

COMPOSE

Lubna Baset Bristi

INTERNET EDITION

December 2002

উৎসর্গ

যাঁর হাত ধরে
আমি বিশ্ব দেখতে শিখেছি।
সদ্য প্রয়াত আমার বাবা
মরহুম হাসান উদ্দিনের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

হাবিবুর রহমান
১৬ই ডিসেম্বর ২০০২
জেদ্দা, সৌদী আরব

আমার ক'টি কথা

ক্ষণস্থায়ী জীবনের অসুস্থ সময়ে যা দেখেছি, শুনেছি, স্মৃতি বিজড়িত সে সমস্ত ঘটনাবলী, যা আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। তারই কিছু অগোছালো ঘটনার খন্ডিত অংশকে গল্পে রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছি।

এ গল্পগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশে ও ইন্টারনেট সংস্করণে সাহিত্যপাগল বন্ধুস্বজন দেওয়ান আব্দুল বাসেত ও অনুজপ্রতিম আনোয়ার হোসেন শিপন যদি পাশে এসে অভয় না দিতেন, তাহলে কখনই আমার সাহিত্য সত্ত্বা আলোর পরশ পেতো না। এঁদের অপরিশোধ্য ঋণের মূল্য ধন্যবাদের ছেঁদো কথায় খাটো করতে চাই না। ওরা থাকুক আমার দুপাশে চিরস্থায়ী বন্ধুত্বের নিগড়ে আবদ্ধ।

হাবিবুর রহমান

১ সর্বনাশের সকাল বেলা

তাড়াতাড়ি শুয়ে পড় সবাই। কাল খুব ভোর উঠতে হবে। আমাদের তাড়া দিল বুড়ী।
তথাস্তু!
বলে আমরা বিছানার আশ্রয় নিলাম। শব্দ দূষণের অনেক আগে ফজরের আযান বাতাসে মিলিয়ে না যেতেই আবার বুড়ীর তাড়া।
উঠো উঠো সবাই। এ্যায় স্বাতী, এ্যায় শুভ। উঠো।
এই কাক ডাকা ভোরে কেন চেঁচামেচি শুরু করলে বলতো! ঘুম জড়ানো কণ্ঠে উস্মার আবেশ। ঘুম কাতুরে স্বাতীর ঘুমের বিচিত্র তরিকা। আধা রাত ঘুমায় সে নিজের বিছানায়। বাকী রাত কিছুটা আমাদের রুমে, কিছুটা শুভর রুমে। কখনো দেখা যায় ডাইনিং টেবিলে মাথা রেখে দিব্যি ঘুমুচ্ছে চেয়ারে বসে। এহেন বিচিত্র ঘুমের রাজ্যে হঠাৎ বুড়ীর চেঁচামেচি বিরক্তির উদ্রেক করাটাই স্বাভাবিক। ঝড়ের গতিতে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সে বললো : আজ কয় তারিখ মনে আছে?
আড়মোড়া ভেঙ্গে চোখ কচলাতে কচলাতে আধবোজা চোখের তেরছা কোণায় জিজ্ঞাসা ফুটিয়ে ওর দিকে তাকাতেই বললো : আজ ১লা বৈশাখ।
"ও !" বলে লাফ দিতে গিয়ে ওর গলা জড়িয়ে বিছানায় কুপোকাত। "ছাড়ো" বলে ঝটকা মেরে গলার বেড়ি ছাড়িয়ে বললো : গেট রেডি।
থুড়ি ! আজ ইংরেজী বলবো না। ১লা বৈশাখ বলে কথা।
ততক্ষণে আমার কন্যা পুত্রের দু'জোড়া চোখ দরজায় সার্চলাইট জ্বালিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি বেরুতে যেয়ে ওদের তাড়া দিলাম।

আমরা যখন রমনা বটমূলে পৌঁছলাম চৌদিক থেকে তখন লোকজন জড়ো হচ্ছে। লাল পেড়ে গরদের শাড়ী, গলায়, খোঁপায় বেলীর মালা, পাজামা পাঞ্জাবী পড়া সুবেশী তরুণ তরুণী, ছোট বড়রা নয়নতারায় স্নিগ্ধ সুন্দরের নরম ভাললাগা জড়িয়ে দিল। হঠাৎ মনে হলো প্রয়োজনে যখন যে বেশ ধরিনা কেন আদতে আমরা খাঁটি বাঙ্গালী। ছোট মেয়েটিও শাড়ী পড়েছে, ছেলেটিও পাজামা পাঞ্জাবী শোভিত। নন্দিত দৃশ্যে দৃষ্টিতে তখন কুসুমিত আনন্দ। "সুদর্শন উড়িতেছে দেখো।"
এ্যায় দেখতো ওরা আসছে কিনা?
কারা?
খুকুরা। আজ মিষ্টি গাইবে।
মিষ্টি ! খুকুর বড় মেয়ে।
হ্যাঁ গো ! মিষ্টি সলোও গাইবে। ছায়ানট ওকে লিফট দিচ্ছে। গলা ভালতো তাই।
আবারো তুমি ইংরেজী বললে? আমার খোঁচা গায়ে না মেখে বললো।
এ সব শব্দ এখন বাংলা হয়ে গেছে। বুঝলে বিদেশী শব্দ না এলে ভাষা সমৃদ্ধ হবে কি করে এ্যাঁ?
জ্ঞান দিয়ো না। বাংলা আমি বুঝি।
কচু।
মা! থামবে। ঐ দেখো ওরা এসে গেছে।
স্বাতীর গলা।
চাইনিজ হোটেলের ওদিক থেকে দুই কন্যাও স্বামীর সাথে খুকুর হাসিমুখ উঁকি দিল। আমরা শান বাঁধানো প্রাচীন বটের পিছনের দিকে জায়গা করে নিলাম। স্বাতীরা মঞ্চের সামনে বসলো। মিষ্টি মঞ্চে। ওদের আনন্দ ধরে না। খুকুর ছোট মেয়েটা দৌড়ে এসে জানান দিল।
মা, দিদি উপরে বসেছে।

হেসে ইশারায় মেয়েকে বিদায় করে খুকু মন দিল আড্ডায়। আমার তৃষ্ণার্ত প্রবাসী চোখ দুটি খুঁজছে পরিচিত জনদের। যদি কেউ নজরে পরে। কাজী আরিফকে সাথে নিয়ে প্রজ্ঞা লাবনী এগিয়ে আসছে। আমাদের দিকে পিছন দিয়ে বাঁয়ে বসে আছেন সনজিদা খাতুন ও ওয়াহিদুল হক। অনেক দিন পর দেখলাম। ওয়াহিদুল হক বুড়িয়ে গেছেন। "জনকণ্ঠে" এঁর কলাম পড়ে বুঝা যায় না এই কলামিষ্ট ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ এতোটা বয়সী। দীর্ঘ পাঞ্জাবীর ভেতর থেকে উঁকি দিল কালো সারসের মত শিমুল মোস্তফার গলা। আমার চোখ খুঁজছে আসাদুজ্জামান নূরকে। নাহ্। এখনো আসেননি তিনি। মিনি সূর্যটাকে ললাটে ধারণ করে ঘামতে ঘামতে এলেন মিতা হক। তাঁর পিছনে তাপ্পি মারা রংচংগা পাঞ্জাবী পরিহিত স্বর্ণকান্তি হাসান ইমাম এলেন শিশুহাসি ঠোঁটে মেখে। সমবেত কণ্ঠে "এসো হে বৈশাখ এসো এসো ..." দিয়ে শুরু হয়ে গেল ছায়ানটের ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। আমার ছোট্ট ক্যামেরাটি নিয়ে উঠে গেলাম মঞ্চের দিকে। মোটা দঁড়ি টানিয়ে বেষ্টনী তৈরী করা হয়েছে। বেষ্টনী ভেদ করে ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই একজন স্বেচ্ছাসেবক বাঁধা দিলেন। প্রবাসে লেখালেখি করি। রিয়াদ ডেইলীর বাংলা বিনোদনের নিয়মিত লেখক। এতোসব বলেও চিড়া ভিজলো না। অতঃপর ব্যাক টু দি প্যাভিলিয়ন। আবার আড্ডা। তবে নূর এলে আমি তার ছবি তুলবোই। নিরাপত্তা বেষ্টনী যত শক্তই হোক। মনে মনে মনকলা খাওয়ার মত প্রতিজ্ঞা করে জায়গায় গিয়ে বসলাম। কথার চুলচেরা চিরুনী দিয়ে ঠাস বিনুনী বাঁধছে বুড়ী ও খুকু। মুগ্ধ শ্রোতার মত গিলছে মানিক দা।

জানো খুকু! আমার শ্বশুড়বাড়ী গাঁয়ে। বলতে পার অজপাঁড়াগা। যদিও রাজধানী থেকে মাত্র ২৪ মাইল দূরে। কিন্তু ঢাকা থেকে আমার শ্বশুড়বাড়ী যেতে সময় লাগে প্রায় আট ঘন্টা। ভাবতে পার। বিয়ের পর কিছুটা লঞ্চে, কিছুটা নৌকায় এবং বাকীটা পালকিতে চড়ে পৌঁছলাম শ্বশুড় বাড়ী। রাত বেশ হয়েছে। হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে বাড়ী আলোকিত করা হয়েছে। আমি যাওয়ার আগে একটা রিকসাও ছিল না ও তল্লাটে। বিজলী বাতিতো দূরের কথা।

তুমি বলতে চাও যে তোমার বিয়ের পরই দোহার থানার উন্নতি হয়েছে?
অবশ্যই।
তার মানে তুমি বউ হয়ে না গেলে ওখানে উন্নতির ছোঁয়া লাগতো না। প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতই থেকে যেতো ও এলাকা?
বুঝতে হবে না ছোঁয়াটা লেগেছে কার। অবশ্য তুমি ও বাড়ীর বউ হয়ে গেলে উন্নতিটা অন্যরকম ও হতে পারতো।
খোঁচাটা গায়ে না মেখে খুকু বললো - বলে যাও, থেমো না।
বুঝলে, সেই যমানায়ও আমার মা মানে আমার শ্বাশুড়ী নববর্ষ উপলক্ষ্যে বাড়ীঘর পরিস্কার করতেন, জামা কাপড় ধুয়ে সব কিছু ঝক্‌মক্ ফিটফাট করে তুলতেন। জানো, নববর্ষের প্রথম দিনের পুরোটা সময় আমার মা আমাকে পড়ার টেবিলে বসিয়ে রাখতেন, তাঁর ধারণা আজকে পড়লে সারা বছর আমি ভাল করে মনযোগ দিয়ে পড়বো। চৈত্র সংক্রান্তিতে আমাদের দেশে ঘোর দৌড় হতো। ষাড়ের লড়াই হতো। ষাড়গুলিকে কৃষকরা ভাংয়ের শরবত খাওয়ায়ে আনতো। তারপর শুরু হতো লড়াই। মত্ত ষাড়ের লড়াই এক ভয়ানক খেলা। আমরা ছোটরা বাবা বা কাকাদের হাত ধরে শংকিত চিত্তে অধীর আগ্রহে খেলা দেখতাম।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে বুড়ীর বয়ান শুরু হলো আবার।

আমার বাপেরবাড়ী জামালপুর শহরে। জামালপুরটা হলো হিন্দু অধ্যুষিত শহর। আমার আব্বার অনেক হিন্দু বন্ধু ছিল। আব্বা ব্যবসা, বাণিজ্য, উঠা, বসা, হিন্দুদের সাথেই করতেন। আব্বার এবং কাকার মৃত্যুর পর আজো আমাদের দুই পরিবারে আসা যাওয়া, খাওয়া দাওয়ার সব রকমের সম্পর্কই আছে। ১লা বৈশাখ। আমরা বলতাম হাল খাতার দিন। বিকালে আব্বার হাত ধরে হাল খাতায় যেতাম। প্রচুর মিষ্টি খেতাম। মিষ্টির সিরায় বাংগীর টুকরা চুবিয়ে চুবিয়ে খেতাম।

এতো বাংগী খেয়ে তোমারতো মোটা হয়ে যাওয়ার কথা বুড়ী। কিন্তু এ রকম স্লিম ফিগার রাখলে ক্যামনে?
না রাখলে তো তোমার দিকে হাত বাড়াতো আমার বর ! আমার চারপাশে মানিক খেজুর কাঁটার বেড়া দিয়ে রেখেছে। কাঁটা বিঁধে রক্ত ঝরাতো।

“আব্বু আসাদুজ্জামান নূর আবৃত্তি করবেন।” শুভ দৌড়ে খবর দিল। ক্যামেরাটা নিয়ে উঠে গেলাম আবার। হাতে একটি “বহুমাত্রিক”। সাইজে ছোট হওয়ার কারণে বুড়ী সবসময় ব্যাগে রাখে এটা। পরিচয়ের সাথে সাথে আত্মপ্রশংসার পানি ঢেলে চিড়ে ভিজিয়ে ফেললাম স্বেচ্ছাসেবক ভাইয়ের। মঞ্চের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে ফটাফট কটি স্নাপ নিলাম। পিছনে চিৎকার শুরুর আগেই কেটে পড়লাম। আসরে ফিরে না গিয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। পান্তার ষ্টলগুলি এবার বেশ দূরে রাস্তার দুপাশে বসেছে। অদূরে শিশু পার্কের সামনে ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠীর মঞ্চ। ফকির আলমগীরের কণ্ঠ ভেসে আসছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান আড়াআড়ি পাড়ি দিয়ে ওপারে গেলে শিশু একাডেমীর অনুষ্ঠান, বাংলা একাডেমী, টি.এস.সি ছাড়িয়ে আর একটু সামনে গেলে চারুকলা ইনষ্টিটিউটের বকুল বেদীতে চলছে আর এক জমজমাট অনুষ্ঠান। ভেতরের অডিটোরিয়ামে দেখানো হচ্ছে “চিত্রা নদীর পাড়ে” সিনেমাটি। ভেতরের কাউন্টার থেকে আটটি টিকেন কিনলাম। দুপুরে “রাঁধুনীতে” ইলিশ পোলাও খেয়ে তিনটার শো দেখবো। পুরো রমনা এলাকা নববর্ষের আনন্দ মেলায় পরিণত হয়েছে। মনে হয় ঢাকা শহরে কোন মধ্যবিত্ত পরিবার আজ আর ঘরে নেই। সবাই বেরিয়ে পড়েছে। আবার ফিরে এলাম রমনা পার্কের বটমূলে। ওদের কাছে ফিরে আসতেই সবাই হৈ চৈ করে উঠলো এক সাথে। কোথায় ছিলে এতোক্ষণ? স্বাতী বললো তাড়াতাড়ি এসো। মিষ্টি গান গাইবে। আমরা সবাই মঞ্চের কোনায় এসে দাঁড়ালাম। মিষ্টি গাইলো। আমরা মনযোগ দিয়ে শুনলাম। কণ্ঠের কারুকাজের কমতি আছে। কিন্তু গলাটা ভারী মিষ্টি।

ওকে ভাল ওস্তাদ রেখে গান শিখা খুকু। ছায়ানটে ক্লাশ করছে। বাসায় শিখা শিখাচ্ছে। শিখাদি ভাল টিচার। তবে আরো অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। তুই খেয়াল রাখিস।
স্বাতী তুই গান ছেড়ে দিলি কেন? এতো মিষ্টি গলা তোর।
আন্টি, সবাই গাইলে শুনবে কে? মিষ্টি গাইবে আমি শুনবো। মজাই আলাদা।
মেয়ে কথা শিখেছে?
আসলে কি জানো আন্টি। এই বিবিএ পড়াটা বেশ কঠিন। ভার্সিটি থেকে ফেরার পর অন্য কিছু করতে ইচ্ছা করেনা। তাই আস্তে আস্তে অভ্যাসটা চলে গেছে। রাগ করোনা, প্লিজ।
স্বাতীর কথার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠলো। আমরা সবাই পূর্বস্থানে ফিরে এলাম। বেশ রোদ উঠেছে। ভোরে যদিও ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ছিল। এখন বেশ গরম। সকালে নাস্তা কারোরই হয়নি। কাক ডাকা ভোরে কি করেই বা নাস্তা করা যায়।
ক্ষিদে পেয়েছে।
আমার কথায় মৌন সম্মতি জানালো সবাই। কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠা যাবে না। লেকের ভেতর লাল শাপলা ফুটে আছে। বটমূল ছুঁয়ে কালাপানি তিরতির করছে। পদ্মপাতা দুলছে মন্থর বাতাসে। মনের ভেতর গুনগুনিয়ে উঠছে “ওরে বিহঙ্গ নারে বিহঙ্গ/এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।” সবে সকাল। আমার ভেতর সন্ধ্যা কেন গুনগুনায়।
এবার লেকে লাশ নেই।
মানে?
দেখো না ফি বছর এই দিনটায় কেউ না কেউ লেকের পানিতে ডুবে মরে। এবার মরেনি। মরলে ভাল হতো।
কথার কি ছিরি!
লেকের কালো জল। মাঝে মাঝে লাল পদ্ম ও শাপলা জড়াজড়ি করে ফুটে আছে। এই থৈ থৈ পানিতে যদি একটি শাদা লাশ ভেসে থাকতো কি ভয়ংকর সুন্দরই না দেখাতো ! কি বলো?
চুপ কর খোকন ভাই!
খুকু চিৎকার করে উঠলো।
বছরের প্রথম দিনটার কি অলক্ষুণে কথা।
আহা! চার হাত পা ছড়িয়ে লাশটি চিত হয়ে ভেসে আছে। পানিপোকা কেঁদে ফিরছে চারপাশে। কালো ভ্রমর মুখে বসছে-উড়ছে।
কি ভয়াবহ নিসর্গ শোভা!

সাট আ-প। মানিকদা গর্জে উঠলো। এ নিপাট ভদ্রলোকের গর্জে উঠাটা উপভোগ করতে না করতেই বোমা ফাটার গগনবিদারী আওয়াজ। টপ্ করে শুয়ে লেকের দিকে গড়িয়ে গেলাম। কারো কথা মনে রইলো না। আওয়াজের পর আওয়াজ। ভয়াবহ বিকট শব্দ। আধা শরীর পানিতে ডুবিয়ে দেখছি চারদিক ধোঁয়ায় ছেয়ে গ্যাছে। আকাশের দিকে কি সব টুকরো উঠে যাচ্ছে। দেখতে দেখতেই আমার উপর অগনন মানুষের শরীর। এভাবে কতক্ষণ কেটেছে জানিনা।

সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখি উঠার শক্তি নেই। চোখে অন্ধকার দেখছি। আমার উপর ভারী বস্তু চেপে আছে। অনেক কষ্টে হাত দুটো মুক্ত করে সর্বশক্তি দিয়ে ঠেলে তুললাম উপরের দেহ দুটি। ওমা! এ দেখি বুড়ী আর খুকু। বুকের ধুক পুকানি দেখে বুঝলাম বেঁচে আছে। জ্ঞান নেই। আস্তে আস্তে হাত ধরে ওদের টেনে তুললাম পানির উপর। ওদের জ্ঞান ফেরাবার সময় নেই। স্বাতী শুভ কোথায়? মিষ্টি বৃষ্টি মানিকদা? এগুনো যাচ্ছে না। সবাই শুয়ে আছে সবাই কি মৃত? হায় আল্লাহ এ তুমি কি করলে ! বুকের ভেতর থেকে হাহাকারের মত গভীর দীর্ঘশ্বাসের সাথে বেরিয়ে এলো কথা কটি। একটু একটু নড়াচড়া। উঠে বসার চেষ্টা। আমার পেছন দিক থেকে কে যেন খামছে ধরলো ঘাড়ের মাংস। পেছনে ফিরে দেখি মানিক দা।

ওরা কোথায়?
হাত বাড়াতেই বুকের মধ্যে আঁচড়ে পরে ডুকরে কেঁদে উঠলো হা ভগবান ! জোর করে মানিকদাকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। আমার ছেলেমেয়ে? কোথায় ওরা? চিৎকার বেরুচ্ছে না গলা দিয়ে। কে যেন সাড়াশী দিয়ে আমার গলা চেপে ধরেছে। ষ্টেজের দিকে এগুচ্ছি আমি। ওরা ওখানেই ছিল। বটবেদীর সাথেই লাগোয়া কাঠের মঞ্চ। আশ্বর্য! মঞ্চটা অক্ষত আছে! মঞ্চের নিচে অনেক মানুষ। ভয়ে কেউ বেরুচ্ছে না। হামাগুড়ি দিয়ে মঞ্চের নীচে গেলাম। অন্ধকার। তমসা ভ্যানিটির ভেতর শুধুই আর্তনাদ। স্বাতী ... শুভ .... ডাকছি - সাড়া নেই কারো। মানুষের ঠাসাঠাসিতে বেশীদূর এগুতে পারলাম না। বেরিয়ে এলাম। পাগলের মত মানুষ দৌড়াচ্ছে। জামা কাপড়ের ঠিক নেই। আহতদের আহাজারি। ছিন্ন ভিন্ন মাংস হাড়গোর। দলা পাকানো মাংসপিন্ড। মানবতার কলংক হয়ে বটের ডালে ঝুলে আছে। মানুষের রক্ত বিটপীর সবুজ পাতায় অশ্রু হয়ে ফুটে আছে। ধুলোয় ধুসর হয়ে গেছে সবুজ রমনা। নীচে রক্তবন্যা। উপরে ধুলোর ঝড়। আমি পাগলের মত চিৎকার করছি। স্বা-তী... শু-ভ... - মি..স..টি - বি..স..টি ..... । মন বলছে ওরা মঞ্চের কাছেই আছে। ফিরে এলাম মঞ্চে। বুড়ী পাগলের মত চিৎকার করছে স্বা-তী-শু-ভ। ওর আঁচল ধুলায় লুটাচ্ছে। কে যেন পারা দিলে বুড়ী হুমড়ি খেয়ে পরলো রক্তধুলোর কাঁদায়। তুলবার শক্তি আমার নেই। খুকু মানিকদাকে ধরে আমাদের দিকে এগুচ্ছে। মানিকদার দৃষ্টি বিভ্রান্ত। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। শিথিল বাহু খুকুকে ধরে রাখতে পারছে না। আমার ভেতর বলছে "লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সোবহানাকা ইন্নি কুনতুম মিনাজ জোয়ালেমিন", 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা বিপদে আমি না যেন করি ভয়।" হাত বাড়িয়ে মানিকদাকে ধরলাম। আমার মিষ্টি বৃষ্টি কোথায়? খোকন ভাই কথা বলছিস না কেন? খুকুর ভাংগা গলা ফরিয়াদ জানায়।

এক হাতে মানিকদাকে অন্য হাতে খুকুকে বুড়ীকে পেঁচিয়ে ধরে প্রাগৈতিহাসিক স্থবির গুহা মানবের মত চারটি প্রাণী দাঁড়িয়ে রইলাম। গুহার ভেতর অন্তহীন তমসা। ঝড়ের ঝাপটায় বাতি নিভে গেছে। মানুষের চিৎকার। কোলাহল। নাম ধরে ডাকা ডাকি। আহতদের গোঙানি। নিহতদের নিথর লাশের উপর আচম্বিতে কারো পা। আতংকে উঠে লাফ দিয়ে অন্য কারো উপরে পড়া। আবার ভয়ার্ত চিৎকার। রোদনে আহাজারিতে কারবালার হাহাকার। দু'জোড়া মানব মানবী আমরা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছি। চার জোড়া চোখ খুঁজছে আপন রক্তসৃষ্ট মুখগুলি, বুকের পাঁজরে যা খোদিত। ওরা কি বুকের ভেতরেই থাকবে না সশরীরে "আব্বু" বলে ডাকবে।

১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট সকাল ৮টা ১৬ মিনিট ১৩ সেকেন্ড। হিরোসীমা নগরীতে আনবিক বোমা নিক্ষেপ করে মার্কিন যুদ্ধ বিমানের কো-পাইলট বলে উঠেছিল "হায় ইশ্বর এ আমরা কি করলাম।" আজকের এই সোনালী সকালের হর্ষ উৎফুল্ল আনন্দ মুখরিত বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে যে ঘাতকরা বোমা মেরে শত শত লোককে হতাহত করলো

তারা কি একটুও বিবেকের দংশন অনুভব করেনি? হয়তো ওরা এদেশের ভুমিসন্তান নয়। মাটির গন্ধ ওদের বুকে লাগেনি। লাগলে এ বিভৎস নারকীয় হত্যাকান্ড ঘটাতে পারতো না।

আব্বু - আম্মু !
শুভর গলা না?
হ্যাঁ ! তাইতো !
মঞ্চের নীচ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরুচ্ছে। আ-ব-বু ...। কাঁদতে কাঁদতে স্বাতী বেরিয়ে এলো। ওর পিছনে মিষ্টি বৃষ্টি।
খুকু
বুড়ি
মানিকদা।

দেখো দেখো। বেঁচে আছে। বেঁচে আছে ওরা। আমার চেঁচামেচি চিৎকারে হতবিহবল মানুষগুলি ফিরে তাকালো। মঞ্চের নীচ থেকে আরো অনেকেই বেরুচ্ছে। মঞ্চের আশপাশে একটা জটলা বেঁধে গেল। আমরা ধীরে ধীরে জটলা থেকে বেরিয়ে এলাম। সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে এগুনো যাচ্ছে না। শুধু কান্না। পুলিশও আসছে না। একটা এ্যাম্বুলেন্সেরও দেখা নেই। এক মহিলাকে দেখলাম পাগলের মত ছুটছে মেয়ের নাম ধরে ডেকে ডেকে। এ মহিলা মঞ্চের কাছেই ছিলেন। আমি যখন ফটো তুলি তখন আমাকে জায়গা দিয়েছিলেন। কিছু বলার আগেই ভীড়ে হারিয়ে গেলেন। আহতদের আর্তনাদ স্বজন হারাদের বেদনা, সব হারানোর হাহাকার উর্ধ্বমুখী আকাশের দিকে ধাবমান দীর্ঘশ্বাস কি আল্লাহর আরশ কাঁপিয়ে দিচ্ছে না? আপনা থেকেই আমার মুখ থেকে বিড়বিড় করে বেরুচ্ছে .. "আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত গোধুলীতে অভিশাপ দিচ্ছি - আমাদের বুকের ভেতর যারা ভয়ানক কৃষ্ণপক্ষ -- দিয়েছিলো সেটে / মগজের কোষে কোষে যারা পুতেছিলো আমাদেরই আপনজনের লাশ / দগ্ধ রক্তাপ্লুত। বুড়ীর কণ্ঠ .. "যারা গনহত্যা / করেছে শহরে গ্রামে টিলায় নদীতে ক্ষেতে ও খামারে / আমি অভিশাপ দিচ্ছি নেকড়ের চেয়েও অধিক / পশু সেইসব পশুদের / খুকু কম্পিত গলা মেলালো ... ফায়ারিং স্কোয়াডে ওদের / সারিবদ্ধ দাঁড় করিয়ে নিমিষে ঝাঁ ঝাঁ বুলেটের বৃষ্টি ঝরালেই সব চুকে বুকে যাবে তা আমি মানি না / মিষ্টির করুণ কণ্ঠ বেজে উঠলো .. হত্যাকে উৎসব ভেবে যারা পার্কে মাঠে / ক্যাম্পাসে বাজারে / স্বাতীর বেদনার্ত গলা .. বিষাক্ত গ্যাসের মতো মৃত্যুর বীভৎস গন্ধ দিয়েছে / ছড়িয়ে / আমি তো তাদের জন্য অমন সহজ মৃত্যু কামনা করিনা। শুভর ক্রুদ্ধ গলা ... আমাকে করেছে বাধ্য যারা / আমার জনক জননীর রক্তে পা ডুবিয়ে দ্রুত / সিঁড়ি ভেঙ্গে যেতে / বৃষ্টির ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠ ... ভাসতে নদীতে আর বন বাদাড়ে শয্যা পেতে নিতে। মানিকদা উম্মাদের মত চিৎকার দিয়ে বল্লেন - অভিশাপ দিচ্ছি আজ সেইখানে দজ্জালদের। "ভয়ার্ত জনতার পলায়নপর মিছিল থমকে দাঁড়ালো। আচমকা ঘুরে দাঁড়ালো। এগিয়ে আসছে জনতা।" আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত গোধুলীতে / অভিশাপ দিচ্ছি। কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে, সামনে থেকে পিছনে ডাইনে থেকে বাঁয়ে ধ্বনিত হতে লাগলো - অভিশাপ দিচ্ছি আজ সেইখানে দজ্জালদের। বোবা মানুষগুলি যেন আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে ... বেশামাল বেহুস মানুষগুলি যেন আবার হুঁশ ফিরে পেয়েছে, ভয়ার্ত রিক্ত নিঃশ্ব মানুষগুলি যেন বেঁচে থাকার মন্ত্র ফিরে পেয়েছে।

সবার কণ্ঠে সেই মৃতসঞ্জিবনী মন্ত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ... "আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত গোধুলীতে অভিশাপ দিচ্ছি। কি যেন যাদু আছে এ কবিতায়। কি যেন অমোঘ শক্তি লুকিয়ে আছে এ কথায়। সাহসহারা ভীতু মানুষগুলি সাহসী হয়ে উঠছে। তাদের শিথিল পেশীগুলি শক্ত হয়ে ফুলে উঠছে। তাদের অচল পাগুলি সচল হচ্ছে। কণ্ঠে ফিরে এসেছে গান। মিছিলের গান। গণসংগীতের জলদগম্ভীর কোরাস সুর। কণ্ঠে ভাসছে। আকাশে মন্ত্রিত হচ্ছে। বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে। ইথারে ইথারে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে অভিশাপ দিচ্ছি আজ সেই খানে দজ্জালদের ...।" প্রতিবাদে প্রতিরোধে বাঙালী বরণ করছে রক্ত নদীতে ভেসে ভেসে। রক্ত পলাশ অর্ঘ্য দিয়ে রক্তিম নববর্ষকে।

(কৃতজ্ঞতা : কবি শামসুর রাহমান)

২ ডলি এসেছে

হাবু, লাবু, কালু ও মিয়াভাই। ওরা চার বন্ধু। মিয়াভাই বয়োজেষ্ঠ্য এবং ওদের গুরু। লেখাপড়া ছাড়া অন্যসব কিছুর হাতে খড়ি মিয়াভাইর কাছে। মিয়াভাই ওদের সবকিছু হাত ধরে শিখিয়েছে। মিয়াভাইর হাত ধরেই ওরা সাবালক হয়েছে। আজ পর্যন্ত মিয়াভাই ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। মিয়াভাইর সব সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিয়েছে, এমনকি সাংসারিক জীবনে প্রবেশের প্রাক মুহূর্তেও মিয়াভাইর সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়েছে। যদিও ওরা বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী। ক্ষুদে ঠাকুরের পাঠশালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রী হাসিল করা পর্যন্ত ওরা একে অপরের সংগী। আজো সে ছায়াসংগীর অনিবার্য্যতা অক্ষুন্ন আছে। ওরা চার বন্ধু এখন জেদ্দায়। সপরিবারে। বাসাও পাশাপাশি বলা চলে একই সাথে। হাবু বই পাগলা - আপন ভোলা। ড্রাইভিং জানলেও তার গাড়ী নেই। এ্যাকসিডেন্টের ভয়ে ওর বন্ধুরা ওকে গাড়ী চালাতে দেয় না। তাই উইকএ্যান্ডের আড্ডাটা বেশীর ভাগ সময় হাবুর বাসায়ই জমে। মূল গল্পে প্রবেশের আগে এ চার বন্ধুর একটু পরিচয় দেয়া দরকার। হাবু আসলে একজন লেখক। রাজনীতি সচেতন এবং অলস। লাবু উচ্চাভিলাসী, রাজনৈতিক কর্মী এবং বন্ধুবৎসল। কালু বন্ধুসেবক, মিষ্টভাষী এবং আপাদমস্তক ভদ্রলোক। এ তিনজনের নিয়ন্ত্রণের লাটাই মিয়াভাইর হাতে। তিনি সর্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং সবার জন্য নিবেদিত।

গল্পের আখ্যান শুরু একটি টেলিফোন কলে।
আপনি কি হাবু মামা?
একটি অপরিচিত কাঁচা মেয়েলী কণ্ঠ।
হ্যাঁ! আমি হাবু কিন্তু মামাটি কার?
আপনি আমার মামা। আম্মু বলেছে আমার চারটি মামা জেদ্দায় আছে। আম্মু আরো বলেছে।
কি বলেছে?
শোনার জন্য উদগ্রীব হলাম।
আম্মু বলেছে, আপনারা আমার জেদ্দা আসার খবর শুনলেই নাকি আমাকে দেখার জন্য ছুটে আসবেন।
যথার্থই বলেছে। মামা যখন।
সে না হয় ছুটেই যাব তোমাকে দেখার জন্য। এখন তুমি বলবে কি তোমার মা'টি কে? নামটি কি?
হ্যাঁ বলবো। তার আগে আমাকে কনফার্ম হতে হবে আপনি সত্যই হাবু মামা কিনা।
আচ্ছা তোমার ইনভেষ্টিগেশন শুরু কর। আমি সমর্পনের ভঙ্গিতে বললাম।
আপনার বাড়ী ওমুক থানার অমুক গ্রামে?
হ্যাঁ - ঠিকই বলেছ।
লাবু মামা ও আপনি একই ইউনিয়নের পাশাপাশি গ্রামের?
হ্যাঁ এটাও ঠিক।
কালু মামা পাশের জেলার পাশের থানার। কিন্তু পড়াশুনা আপনাদের সাথেই।
একেবারে ঠিক। এতো সব তুমি জানলে কি করে?
আরো আছে। মিয়াভাই মামা।
বাঁধা দিয়ে বলি: "মিয়াভাই" আবার "মামা" হলো কি করে?
মিয়াভাইতো উনার কমন নেম। আপনাদের। আমারতো মামা।
অকাট্য যুক্তি। তাই নিশ্চুপ থাকি।
হ্যালো! মামা ফোন রেখে দিলেন নাকি?
না। শুনছি। বলে যাও।
হ্যাঁ - যা বলছিলাম। মিয়াভাই মামা ও আপনাদের বাড়ী একই থানায় কিন্তু পাশ্ববর্তী ইউনিয়নে। আপনারা সবাই ছোট বেলা থেকে একই স্কুলে একই সঙ্গে পড়াশুনা করেছেন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ্যাম আই রাইট?

ইয়েস! মাই বয়।
ওহ্ বয় না। গার্ল। আমি আপনার মেয়ের মত। কয়েক মাস আগে আমার বিয়ে হয়েছে। আপনাদের জামাই জেদ্দায় একটা কোম্পানিতে চাকুরী করে। ক'দিন হলো আমি এসেছি। আসার সময় আম্মু আপনাদের ডাটা দিল।
তোমার স্বামীর নাম ধাম ও কোম্পানীর নামটা বলবে কি?
কোম্পানীর নামটা আমি জানি না। এখনো জিজ্ঞেস করিনি।
তুমি কিন্তু এখনো তোমার মায়ের নাম বলনি। তোমার নামও না।
মামা! আচ্ছা আপনি কেমন মানুষ বলেনতো? এতো কিছু বলার পরও আপনি বুঝতে পারলেন না আমি কার মেয়ে। আমার নাম মৌললি।
বয়সের সাথে সাথে স্মৃতিও প্রতারনা করে রে মা!
আপনার এমন কিছু বেশী বয়স হয়নি। মৌললি ফোনেই ঝামটা মারলো আমায়।
এতো দেরী করে মানুষ। কখন থেকে আস্তে আস্তে হাটছি। সাথের সবাই ততোক্ষণে স্কুলে পৌঁছে গেছে। মুখ ঝামটা মারলো ডলি।
কে মেয়েটি! গলাটা যেন ঠিক ডলির মত। ওকি ডলির মেয়ে। ডলির বিয়ে হয়েছে জানি। আমরা ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পরই সম্ভবত: ওর বিয়ে হয়। তাহলে ও কি? ...
হ্যালো - হ্যালো - হ্যালো - মামা - মামা।
ফোন ধরেই ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি!
না ঘুমাইনি। ডুব দিয়েছিলাম।
ডুব দিয়েছিলেন? কোথায়?
স্মৃতির সাগরে।
আচ্ছা মানুষ আপনি।
ওকে থামিয়ে দিয়ে আম্‌তা আম্‌তা করে বলি। তুমি কি ... তুমি কি ... ডলির মে - য়ে।
ওয়াও! বাঁচালেন! কে বলেছে আপনার স্মৃতি কমে গেছে। ইউ আর ষ্টিল ইয়ং। হ্যা মামা আমি ডলিরই মেয়ে। বড় মেয়ে।
কি করে তোমার সাথে দেখা হতে পারে?
বলছি। সেজন্যইতো ফোন করা।
বেশ।
আপনার বাসার লোকেশনটা দিন। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমরাই আসছি।
তোমরা কারা?
আমি আপনাদের জামাই ও আম্মু। আব্বু বাসায় থাকবে।
ডলি এসেছে?
হ্যা।
এতোক্ষণ তো বলোনি?
আপনার সাথে মজা করার জন্য। আব্বু আম্মু ওমরাহ্ করার জন্য এসেছে। আম্মুর অবশ্য একটা গোপন ইচ্ছা আছে।
সেটা কি?
আপাতদৃষ্টিতে মেয়ের সংসার গুছানো। তবে অন্য একটা ...
থাক্ থাক্ আর অন্য ইচ্ছার কথা বলতে হবে না।
কবে আসছ তোমরা? তাতো বললে না।
থার্সডে নাইট। বিস্যুতবার রাতে। হাতে এখনো সময় আছে। আপনার বন্ধুদের বলে রাখবেন। রাখি মামা। বিস্যুতবার দেখা হবে।

ডলি এসেছে। কতদিন পর ওর সাথে দেখা হবে? শেষ দেখেছিলাম কবে? সম্ভবতঃ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার পর ঢাকা থেকে বাড়ী যাওয়ার পথে লঞ্চে। ওরা নবাবগঞ্জ কলেজঘাট থেকে লঞ্চে উঠেছিল। সবাই ডি.এন কলেজের ছাত্রছাত্রী। আমরা ঢাকায় পড়ি। লঞ্চের রেলিং ধরে আমরা দুজন দাঁড়িয়ে ছিলাম। ইছামতির কালো জলকে দুভাগ

করে সাদাফেনার মধ্যে লঞ্চ এগিয়ে যাচ্ছিল বান্দুরার দিকে। এখানে লঞ্চের গতি শ্লথ। দুপাশে গ্রাম। পাড় ভাঙ্গার ভয়। ভয় কি ডলির মধ্যেও ছিল? ওকে যেন কিছুটা বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। বার বার বলছিল তোমার সাথে দেখা হয়ে ভালই হলো। ভাবছিলাম তোমাদের বাড়ী যেয়ে চাচীর কাছে তোমার বাড়ী আসার খবরটা জেনে নিব।
কি ব্যাপার, এতো জরুরী?
তুমি পাশ করে কি করবে? একটা চাকুরী নাও না। আর নাইটে বি.এ. পড়।
কেন?
চাচার বোঝা কিছুটা হালকা হবে। আবার কেন?
সেটা ঠিক।
ঠিকই যখন বুঝছ। তবে তাই কর। আমিও নিশ্চিন্ত হই।
তোমার চিন্তার হেতু কি?
আছে। কারণ ছাড়া কোন কাজ হয় না। আবার সব কথার পিছনে কারন খুঁজতে যাওয়াও ঠিক না। জানো আফসানার বিয়ে হয়ে গেছে?
সেতো এস,এস,সি পরীক্ষার পরই।
পরীক্ষার নয়, পাশের পরে। ফাকিহারও বিয়ে হয়ে গেছে।
সেকি! কার সাথে?
কেন, যার সাথে প্রেম করতো ওর ফুফাতো ভাই।
কি বছল? ওর তো মিয়াভাইর সাথে পিটিস পিটিস ছিল।
দেব না যনন্তি কুতু মনুষ্যা।
কি বলছ?
সংস্কৃত শ্লোক। তুমি বুঝবে না।
সবই তুমি বুঝ। আমি কিছুই বুঝি না।
এইতো রেগে গেলে।
রাগবো না।
আচ্ছা বলতো। এতো রাগ কেন তোমার? সেই ছোট বেলা থেকেই দেখে আসছি কোন কিছু পছন্দ না হলেই রেগে যাও। তোমার পছন্দেই কি দুনিয়া চলবে। বলো?
দুনিয়া না চললো। তুমি চললেই হলো।
সত্যিই।
হ্যা।
আর একবার বলো
কি?
হ্যা।
আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।
ইছামতির জল খল্খল্ করে পাড়ে আছড়ে পড়ছে। সাদাপুর পার হচ্ছি। আমি বড় ফুফুর বাড়ীটা দেখার চেষ্টা করলাম। না এখনো ভাঙ্গেনি। আগের মতই আছে। টিনের উঁচু চালা দেখা যাচ্ছে। ডলি রেলিংয়ে রাখা আমার হাতের উপর হাত রাখলো।
কি ভাবছ?
কিছু না।
ওর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ও সব সময়ই ঘামে। গরম একদম সহ্য করতে পারে না। বিন্দু বিন্দু ঘামগুলি ওর শ্যামলা মুখে সাদা সাদা ফোটায় ফোটায় জল ফুলের মত ফুটে উঠেছে সাদা শাপলার মত। ডলি কি জলকন্যা! ওদের বাড়ীর পিছনে প্রকান্ড কোঠাবাড়ীর চক্। বর্ষার থই থই পানিতে অশান্ত ঢেউ। ধানের সবুজ ডগা পানির সাথে পাল্লা দিয়ে লম্বা হচ্ছে। মাঝখানে ভেসালজাল পাতা। জেলেরা মাছ ধরছে। টাটকিনি, নওলা, সারপুঁটি, বাঘনা কত কি। কিনারে সাদামুখ শাপলার হাসি। ডলি শাপলা তুলছে। শাপলার রংয়ের মতই ওর হাতের রং। ওর ছোট ভাইটি ওঁচা দিয়ে ইছা মাছ ধরছে। বর্ষায় শাপলা গ্রাম বাংলার একটি প্রিয় সবজী। ছোট চিংড়ি সহযোগে রান্না করলে উপাদেয় খাদ্য।

এ্যাই কি হয়েছে তোমার।
ডলি আমার হাত ধরে জোরে নাড়া দেয়।
কি আশ্চর্য্য মানুষ। কোন দিকে তাকিয়ে আছ এ্যা। ঢাকায় কেউ আছে না কি? এ্যা - এই কথা বলো।
সুযোগ দাও।
কিসের সুযোগ। পিটিস পিটিস করার? কার গলায় ফাঁস পড়ালে? আমাকে তো ফাঁসিয়েছ আবার কার জন্য ফাঁদ পেতেছ? এ্যা।
আরে বাবা। একটু থামবে। আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেবে। সেই একটানা বগ্‌বগ্‌ করেই চলছো।
লঞ্চ বান্দুরা ঘাটে ভিড়লো। ছোট জেটি। সবার নামার তাড়া। ডলি বললো : কাল বাড়ী এসো। আমাদের বাগানে সুন্দর গোলাপ ফুটেছে। আব্বা ও তার প্রিয় ছাত্রকে দেখলে খুশী হবেন।
আমাদের কিছুটা পথ হাটতে হবে। আরো কিছুক্ষণ একসাথে থাকা যাবে। ডলি ওর কাঁধের ব্যাগটি ঠিক করে নিল। আমি আমার হাতেরটি। প্রশস্ত কাঁচা সড়ক। বাঁশ ঝারের নীচ দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম বাড়ীর দিকে। কাঁচারি ঘাট এলে আমাদের পথ দুদিকে চলে যাবে।
আব্বু!
পড়ার টেবিল থেকে এক লাফে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো আমার মেয়েটি। ফোরে পড়ে। অথচ এখনো আবুঝ শিশু।
লাবু ডলি এসেছে।
কোন ডলি?
সেই যে আমাদের সাথে পড়তো। মনে নেই?
আছে। ডলিকে কি ভুলা যায়। তা বিষয় বিত্তান্ত কি?
কাল এলেই বুঝতে পার বি?
ওরা কি তোর বাসায় আসবে?
ইয়েস।
ও - কে।
খান সাব ডলি এসেছে। (কালুকে হাবু মাঝে মাঝে আদর করে খান সাব ডাকে।
তোর সেই ব্লাক ডায়মন্ড?
ব্লাক বললি কেন? ডলি কি কালো?
না না ধলো। তা কবে কখন কিভাবে এলো?
সবই জানবে বন্ধু। কাল এসো। এশার পরে।
মিয়াভাই ডলি এসেছে।
সেই বেয়ারা মেয়েটা, যাকে তাকে ভেংচি কাটতো? ল্যাং মারতো?
তোকেও মেরেছে নাকি?
না।
তোর বোধহয় একটু লাগলো।
কাল আয়। তারপর দেখা যাবে কার কতটা লেগেছিল।
ওদের দুজনকে বলেছিস?
হ্যা।
জিতুর সাথে কথা বল।
দে।
হাবু ভাই কিছু নিয়ে আসতে হবে?
না।
বুড়ীই তোমাদের খাওয়াবে। মেহমানের অনারে।
ঠিক আছে।
ওরা এলো। চারবন্ধু মিলিত হলো। যেমনি হয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে। তবে আজকেরটা ব্যতিক্রম। আজ লাবুর ঝগড়ার মেজাজ নেই। কালু কোন সমস্যা আছে কিনা জানার জন্য বুড়ীর কাছে কিচেনে গেল না। মিয়াভাই

কোন উপদেশ ঝারলো না। সবার ভেতরই একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়। চেহারায় বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ ঝিলিক দিচ্ছে থেমে থেমে। মিয়াভাই আস্তে ড্রইংরুমের দরজাটা বন্ধ করলো। বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে ডিম লাইটটা জ্বালিয়ে দিল কালু। লাবুর ব্যাস্ত কণ্ঠ "বল্"।
মৌললির সাথে ফোনালাপের বিস্তারিত জানালো হাবু বন্ধুদের। রানু শিরি জিতু বুড়ী। ওরা আড্ডা জমিয়েছে বেড রুমে। স্বাতীর রুমে বাচ্চারা কার্টুন দেখছে। ড্রইংরুমের দরজা বন্ধ। ভেতরে স্মৃতি তাড়িত ওরা চারজন।
চাঁপা গাছটির নীচে। কাঠালি চাঁপা।
কি বলছিস বিড়বিড় করে এ্যাই লাবু।
না। কিছু না।
চাঁপা গাছের নীচে - বলে যা - ।
কালু লাবুর পাশে সরে এসে অভয় দিল।
হেড স্যারের বাসার সামনের ফুল গাছগুলি আসলেই জংগলে পরিণত হয়েছিল।
হ্যা - মেয়েরা বারান্দায় বসলে কিছু দেখা যেত না।
গাছের নীচে দাঁড়ালেও না।
ওতেই তো সুবিধা ছিল বেশী।
যে কেউ কথা বলতে পারতো - পাতার আড়ালে।
ফুলের গন্ধ নিয়ে
তুমি কি শুধুই ফুলের গন্ধ নিয়েছ? অন্য কোন গন্ধ নাওনি?
আমি শুধুই চলার সংগী ছিলাম। আর কিছু না।
মিথ্যা কথা।
থাম্ লাবু। ফড়কাসনে। তুইও কিন্তু কম যাস না।
মানে?
মানেটা হলো তোর স্কোর কত?
আমি কি ক্রিকেটার নাকি?
বলব্যাটের ক্রিকেটার না হোস প্রেমের তো বটেই।
কালু তোকে আমি কাঁচা খাব।
ব্যাটিং রাখ। এখন ফিল্ডিংয়ে আয়। থাম সবাই।
ব্যাটিং তো রাখবই আমরা। তুমি তো সেঞ্চুরী করে বসে আছো। ডবল সেঞ্চুরী।
আমরা কিন্তু হেড স্যারের বাসা থেকে ক্রিকেট মাঠে চলে গেছি। ফিরে এসো বন্ধুরা।
কোথায়?
জয়পাড়া।
প্রিয় জয়পাড়া।
প্রতিটি গাছের ডালে স্মৃতি ঝুলে আছে।
মাটি ও যেন কথা কয়।
কতদিন
অ - নে - ক।
মিয়াভাই হেডস্যারের ছেলেটা ওর কোলে দিয়ে কি বলেছিলি?
আমি না। লাবু।
আমিও না। শাহাদাত।
কোল থেকে কোলে।
বলাবলি ছোঁয়া ছোয়ি, আরো কত কি?
তুমি যে চলার সংগী।
চলার নয়রে ভাই পথের সংগী।
কাছাকাছি বাড়ীতো তাই। হাত ধরে স্কুলে যাওয়া আসা।

তুই কি দেখেছিলি কালু?
না অনুমান।
অনুমান সর্বদা সত্য হয় না। বলেই হাবু মাথাটি সোফায় এলিয়ে চোখ মুদলো।
দার্শনিক হয়ে গেলি যে।
চোখ বজলে কি দুনিয়া অন্ধকার হবে। তুই ই মজেছিলি।
আমি একা নই আমরা সবাই।
খালেদার কাছ থেকে টাকা এনে আমি তোকে রসগোল্লা খাওয়াতাম। আর তুই এখন আমার বিরুদ্ধে বলছিস। লাবুর অভিমানী কণ্ঠ।
মিনা তিনা কতজনেই তো তোমাকে মিষ্টি খাওয়ার জন্য টাকা দিত, গাঙ্গপাড়ের হিরো।
আরে লাবুতো শুধু মিষ্টি খেতো। মিয়াভাইতো আরো এক পা এগিয়ে।
মিয়াভাইর প্লাস পয়েন্টও একটা আছে।
পীরজাদা।
কারো প্রতি নজর দিলে তার পুন্যি হত।
শুধুকি তাই, তিনিতো বিশ্বপ্রেমিক।
ব্রাভো ব্রাভো। যথার্থ উপাধি।
আমি বিশ্বপ্রেমিক হলে তোমরাও বিশ্বচেলা।
এখনতো দেখছি গুরু মারা শিষ্য।
আমরা কেউ ধোয়া তুলসীপাতা নই।
বয়সের ধর্ম।
মনের রং।
রংতো শুধু মনেই লাগেনি, ক্লাশরুমেও লেগেছিল।
ভুল, ওয়েটিং রুমে।
যেখানেই লাগুক, লেগেছিল।
শুধুই রং। আগুন লাগেনি।
তাও লেগেছিল। তবে এতোই ধিকিধিকি যে চর্মচক্ষে দেখা যায়নি।
তবে কি মনের চোখে?
যারা দেখবার তারা দেখেছিল।

নিশুতি রাতের কাঁটা প্রহরের সীমানা অতিক্রম করে যাচ্ছে। অতিক্রান্ত সময়ের স্মৃতির শরীর ভর করেছে চারটি মানুষের উপর। চারটি মানুষ যেন কোন এক দেবদূতের সামনে বিড়বিড় করে কনফেসনের প্রার্থনায় নতজানু হয়েছে। সময়ের সিঁড়ি বেয়ে স্মৃতি যেন টাইম মেশিনের মত ওদের নিয়ে গেছে তোলপাড় করা তারুণ্যে। বীনা তারে কখনো বীণা বাঁজেনি, সুর উঠেনি বেসুরো গলায়। তবুও তারুণ্যের গানে ঝংকৃত সুর শুধু মথিত করেনি জয়পাড়াকে। জেদ্দার আকাশেও কি সে রং লাগেনি? তবে কেন কারো আগমনী বার্তা যৌবনের শেষ পদানিতে দাঁড়ানো চারটি মানুষকে দুঃখ জাগানিয়া স্মৃতির সিঁথিতে সীমান্তবর্তী করছে? আসা যাওয়ার এই অতি সহজ চলাচলে হৃদয়ানুভূতি কেন উদ্বেলিত আন্দোলিত হয়?

মূলতঃই কি ডলি এসেছে? কে ডলি? কে মৌললি? কল্পিত বিষাদে নিমগ্ন হওয়ার একি কোন অজুহাত, নয়তো কেন মৌললি তার স্বামীর নাম বললো না। তার স্বামীর কোম্পানীর ঠিকানা বা টেলিফোন নাম্বার? নিজেকে আবিস্কার করার, নিজের ভেতরটাকে চিরে দেখার অদম্য ইচ্ছাই কি এ চারটি মানুষকে একত্রিত করেছিল। কোন এক ডলির কল্পিত আগমনে? কি এমন দুঃখ বা সুখানুভূতির তাড়না ওদের অতীতমুখী করলো? সে কি মাটির টানা? নাড়ীছেড়া রক্তাস্রোতের অমোঘ গতি। বুকের ভেতর এক টুকরো বাংলাদেশ এমনি ভাবেই কি পুতে রাখে স্মৃতির চারা?

৩ মোড়ার বাড়ীর ফজলা

কুমুরগঞ্জ হাটের শেষ মাথায়। যেখানে ইছামতির পাড় ভেঙ্গে নদী আরো গহীন হয়েছে। কালোজল তিরতির করে ওপারে জেলে পাড়ার আঁচল ভিজিয়ে বয়ে চলছে দক্ষিণে। আরো দক্ষিণে পদ্মা যেখানে প্রমত্তা হয়ে আছড়ে পড়ছে। পাড় ভাংগছে পাতড়াইলের। সে দিকে ইছামতির রোখ। এখানে ইছামতি গভীর কিন্তু শান্ত। ইছামতি কখনই অশান্ত ছিল না। তবে কিছু কিছু পাড় কোথায় সেও ভাঙ্গে। যেখানে তার মাথাটি আউলা হয়ে যায়।

কুমুরগঞ্জ হাটের শেষ মাথা। একটি কুঁড়েতে কুপি বাতি টিম্‌টিম্ জ্বলছে। আঁধার রাতের কালো নেকাবের উপর জেলা বোর্ডের সাদা রাস্তা। তার দেহ বিছিয়ে আল্‌গা হয়ে শুয়ে আছে। দুপাশে শষ্যের সবুজ মেলা। কুমুরগঞ্জ মাঠটি খা খা করছে। কে যেন বিশাল একটি কালো চাঁদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে মাঠের শক্ত শরীর। মাঠটি নামকরা। যেমন হাটটি। একদিন ছাড়া ছয়দিন মাঠে খেলা হয়। ফুটবল দাড়িয়াবান্দা, হাডুডু। কখনো বা এক কোনায় ভলিবল। এ তল্লাটে ভলিবল বেশ জনপ্রিয়। একদিন হাটবার। সেদিন কোন খেলা নেই।

কুমুরগঞ্জ মাঠটি শুয়ে আছে কালো চাঁদর মুড়ি দিয়ে। জেলা বোর্ডের সাদা শরীরের উপর লম্বা কালো পা ফেলে একটি মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে শিষ বাজিয়ে। হাট ভেঙ্গে গেছে অনেক আগে। টোকই পোলাপান ও হাটুরেদের হারিয়ে যাওয়া আনি দুয়ানি, মাছ বাজারের এক আধটা মাছ কিংবা সবজী বাজারের আলুটা পটলটা বা একটা পোকায় খাওয়া বেগুন কুড়ানো শেষ করে চলে গ্যাছে সেই কখন। হাটটি ঝিমুচ্ছে। শরীরে তার প্রচন্ড ব্যথা। ব্যথা কি শুধু শরীরে? মনেও? তবে মনের ব্যথার কথা বলার কেউ নেই। কুপি বাতিটি টিমটিম করে জ্বলছে। কুঁড়ে ঘরটি গাছের তলে ছায়ায় ঢাকা। রোদ বৃষ্টি মাথায় করে কুড়েটি এখনো টিকে আছে। একটি মাত্র ঘর। এক সময় অনেকগুলি ঘর ছিল। আজ আর নেই। হয়তো একদিন এ ঘরটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তবে কবে তা কেউ বলতে পারে না।

লোকটি বড় রাস্তার সাদা শরীর ছেড়ে বাম দিকে ক্ষেতের আলে নেমে এলো। আলে বিভক্ত ক্ষেতগুলি আড়াআড়ি শোয়া। সিথান মোড়ার বাড়ীর দিকে। পৈথান মাঠ বরাবর। লোকটি ক্ষেতের মাঝদিয়ে মাঠের দিকে চলছে। তার গন্তব্য মাঠ পেড়িয়ে। শেষ মাথার টিমটিম কুপি বাতি। লোকটি চলছে। কালো পা। লম্বা লম্বা কাইক দিয়ে চলছে সামনে। হাফ হাতা আকাশী রঙ্গের সার্টে তাকে একটি ছায়াশরীর মনে হয়। জিহ্বা ও ঠোটের মিলিত নিপুন কৌশলে শিষ বাজাচ্ছে মৃদু সুরে। নিঃশব্দ রাতের স্তব্ধতাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে জলতরঙ্গের সুর তুলছে তার শীষ যুবতী ধানের সবুজ পাতায়। লোকটি চলছে। কেন চলছে? কেউ কি জানে? হ্যাঁ জানে। জানে শুধু একজন। সে মরন পাগলা। মরন পাগলা লোকটির নিশিসঙ্গী। চটের চাঁদর গায়ে জড়িয়ে সে চলে নিঃশব্দ ডাহুকের মত। কচুরিপানার উপর দিকে ছোট্ট ডানকানা মাছ ধরার মত নিঃশব্দ নির্বিকার।

ইছামতির কালো জল তিরতির করছে। জৈষ্ঠের ডমরু বাঁজিয়ে আষাঢ় আসি আসি করছে। এ সময়টি মোড়ার বাড়ীর ফজলা ভীষন ব্যস্ত। ব্যস্ত বললে ভুল হবে। সে টেনসনে ভোগে। কাস্তে হাতে কারণ অকারন ক্ষেতের পাশে ঘুর ঘুর করে। আর আকাশের দিকে তাকায়। যুবতী ধান গাছ এখন গর্ভবতী। আউশের ক্ষেত ফুলে উঠেছে। পেটে তার সন্তান। সাদা সাদা ধানবীজের ভ্রুণ। ধানে দুধ এখন ঘন হয়ে উঠেছে। আর কটা দিন গেলেই পুরুষ্ট ধানে পাক ধরবে। তারপর আষাঢ়ের মাঝামাঝি সোনালী আউশে ভরে যাবে আঙ্গিনা। চুমকী মরুকী ভরা আগইল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করবে। ধান মলাইয়ের গরুগুলি খর মুখে হাম্বা রবে ডেকে উঠবে। ফজলা সম্মিত ফিরে পায়। কে যায় ও পাশ দিয়ে? ছায়া শরীর দুলে দুলে চলছে মাঠ পাড়ি দিয়ে। ফজলা মুখ ফিরায়। ধানের মধুর গন্ধে মাতোয়ারা সে এখন। এ মৌতাত থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না। ছায়াশরীর এগিয়ে যায়। সে সাথে মরন পাগলার নিশিশরীর।

শান্ত সুবোধের মত কুলকুল বয়ে চলে ইছামতি। তার শরীরেও যৌবনের হাওয়া লেগেছে। আর কদিন পরেই নামবে আষাঢ়ের ঢল। তখনও প্রমত্তা হবে না। থাকবে প্রমিত। তবে বাড়বে চঞ্চলতা। শরীরের রং বদলে যাবে।

কালো রং গৈরিক রূপ নেবে। তাতে সূর্য্যের আলো পড়ে শরীর করবে চিকচিক রূপালী বোয়ালের পেটের মত। ইছামতির ওপারে জেলে পাড়া। এ পাড়ে নিকারী পাড়া। জেলেরা মাছ ধরে নিকারীরা মাছ বেচে। এদের বলা হয় বেপারী। জেলেরা হিন্দু। নিকারীরা মুসলমান। ভদ্র লোকেরা এদের অচ্ছুৎ মনে করে। মনে করে ছোটজাত। হিন্দু মুসলমানের দুরত্ব ইছামতির নৌকা দিয়ে পাড়াপার করা যায় জীবিকা প্রায় একই রকম হওয়াতে। এদের আন্তরিকতা ও সৌহার্দের বন্ধন দৃঢ়। নৌকাই এদের যেমন জীবিকার অবলম্বন। তেমনি হৃদয় পাড়া পাড়েরও খেয়া। কুঞ্জ বেপারী মাছ বেচে। আবার মাছ ধরেও। তবে জাল দিয়ে নয়। সে মাছ ধরে বড়শি দিয়ে। ২/৩ দিন ধরে মাটির নীচে গর্তে ইচা মাছ পচায়। পরে সে পচা ইঁচা দিয়ে মন্ড বানিয়ে রাতের আলো আঁধারে ইছমতিতে নৌকা ভাসায় মাছ ধরতে। কখনো পায় বোয়াল, আইড় কিংবা রুই কাতলা। কখনো বা বন্ধ্যা নারীর মতই মৎস যাত্রা হয় নিস্ফলা।

কুপি বাতি জ্বলছে টিমটিম। লোকটি চলছে কুপি জ্বালানো কুঠীরের দিকে। কি আছে? কে আছে ঐ কুটিরে? জানে শুধু লোকটি। আর জানে মরন পাগলা। মরন পাগলা ছায়া শরীরের ছায়া সঙ্গী। বৃদ্ধা রাধা চূড়া গাছটির তলায় লোকটি এসে দাঁড়ায়। পকেট থেকে বিড়ি বার করে ফস করে ম্যাচ জ্বালিয়ে বিড়ি ধরার। এ অঞ্চলে সখিনা বিড়ি ঘোড়া ম্যাচ বেশ জনপ্রিয়। সবার পকেটেই শোভা পায়। নিছিদ্র অন্ধকারে রাধাচূড়া গাছের তলায় কুড়ে ঘরটি দাঁড়িয়ে আছে আদিভৌতিক প্রেতের মত। কোন দ্বিধা নয়। বৃদ্ধ ও তর্জনীর মিলিত কৌশলে বিড়িটি ফেলে দেয় অদূরে দূর্বার উপর। তারপর অবলীলায় ঝাঁপ খোলে ভেতরে প্রবেশ করে। বাহির থেকে ঝাঁপ খোলার কায়দা দেখে বোঝা যায় এ কুটিরে তার যাতায়াত দীর্ঘদিনে। কুপি বাতি জ্বলছে টিমটিম। মরন পাগলা জ্বলন্ত বিড়ির গোড়াটি কুড়িয়ে নিয়ে লম্বা টান দেয়। সুখটান দিয়ে বিড়িটি পায়ের তলায় পিষে মারে। এভাবে যদি ক্ষুধাকে সে পায়ের তলায় পিষে মারতে পারতো। সে জানে তা হবার নয়। আজ রাতে মরনের ক্ষুধা নিয়ে ভাবনা নেই। সে দেখেছে শেষ দুপুরে ডিমভরা ইলিশের বিক্রি ভাল হয়েছে জলিল বেপারীর। মাছ বেচা শেষ করে বেপারী যখন টাকা গুনে থলিতে রাখছিল সে তখন বেপারীর মুখে তৃপ্তির হাসি দেখেছে। নির্ঘাত আজ বেপারীর ৮০/৯০ টাকা লাভ হয়েছে। এটা মরন পাগলার অনুমান। তা না হলে নিশিপদ্মের মধুর লোভে আজ জলিল বেপারী ফুলবাবুটি সেজে চিতরঙ্গীর ঘরে আসতো না। চিতরঙ্গী হালদার। মরন পাগলার একমাত্র বোন। ওদের দুটি ভাই বোনকে পথে ফেলে মা বাবা মরেছে সে অনেক আগে। মা বাবার চিতার আগুন এখন আর ওদের বুকে কখনই জ্বলে না। ক্ষুধার অনলে স্মৃতি ছাই হয়ে গেছে। সেই ছাইয়ের গাদা থেকে জন্ম নিয়েছে দেহপসারিনী চিতরঙ্গী ও মরন পাগলা। মরন পাগলা যতটা না ভবের পাগল তার চেয়েও অনেক বেশী ভাবের পাগল। ফকির বাড়ীর মেলায় তার ভাবের প্রকাশ হয়। পোদ্দার বাজারের বড় শশ্মান ঘাটেও কখনো সখনো তার ভাবের নদীতে বান ডাকে। শান্ত ইছামতিকে অশান্ত করে তুলে। কালো কষ্টি পাথরের মুর্তির গায়ে রেড়ি তেলের প্রলেপ দিতে দিতে আখেরে যে চিকচিকে ঔজ্বল্য আসে। চিতরঙ্গীর যৌবন ভারাক্রান্ত শরীরেও তেমনি চিকচিকে ভাব আছে। যৌবনের বিপুল দেহসম্ভার নিয়ে কুমুর গঞ্জের হাটবারে শেষ বিকেলের আলো আধারিতে যখন চিতরঙ্গীর ছিনালী হাসি ঝিলিক দেয় রাংগা ঠোঁটের কোনে। তখন হাটফেরত বেপারীদের শ্রান্ত দেহের উপর বিদ্যুৎ খেলে যায়। কোথা যায় শ্রান্তি ক্লান্তি। কাঁচা পয়সার গরম আর দেহের আগুন মিলে তাঁদের খোদার ষাড়ের মতই ছুটিয়ে নিয়ে যায় চিতরংগীর ঘরের দিকে। মরন পাগলা খুশি হয়। বোনের দেহ বেচা পয়সায় তার পকেটও ভারী হয়।

আকাশে দ্বিতীয়ায় চাঁদ উকি দিয়েছে। হালকা মেঘের ছুটাছুটি কচি চাঁদের আলোতে গোল্লাছুট খেলার মতই মনে হচ্ছে ফজলার কাছে। ক্ষেতের আলে কোমরের গামছাটি পেচিয়ে সে আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে আছে। পাশে তার কাস্তেখানি। জৈষ্ঠের শেষ। আষাঢ় শুরু হতে যাচ্ছে। দুএকদিনের মধ্যেই আউশ কাটতে হবে। ফজলা হিসেব করে বৃষ্টি আসতে আর ক'দিন বাকী। কুপি বাত্তি টিমটিম জ্বলছে। আঁচল দিয়ে চিতরংগী বেপারীর মুখের ঘাম মুছে দেয়। ইদানিং সে ঘরে নতুন লোক ঢুকায় না। চিতরংগীর সারা মন জুড়ে বেপারীর ছবি। দেহজুড়ে বেপারীর আদর। পেটের ভেতর তোলপাড়। হাটের নটীর চোখে গেরস্থ বউ হওয়ার স্বপ্ন। বেপারীর লোমশ বুকে মাথাটি রেখে চিতরংগী শুধায়

ভাত খাইছ?

হ

কে রাইন্দা দিল?

করিমের বউ।

বেপারীর শরীরে ইলিশ মাছের আঁশটে গন্ধ বুক ভরে টেনে নিয়ে চিতরংগী কবুতরের বাচ্চার মত আরো ঘনিষ্ট হয়। তোমার ছোট ভাইর বউটি বেশ লক্ষী। একদিন দেখেছি আমি। ঘাটে পানি আনতে গেছে। আমিও নাইয়া উঠলাম কিন্তু কতা অয় নাই। চৌচালা টিনের ঘর দিলা। দূর থিহা দেহা যায়। তয় জোড়া ঘর দিলা ক্যা বেপারী?

দুই ভাইর দুই বউ থাকবো তাই।

আমারে বিয়া করলে সমাজ কি মাইনা নিব?

নিলে নিল। না নিলে নাই।

তোমার না জোড়া ঘরের স্বপ্ন স্বপ্নই থাইক্যা যায়। সাত ময়ালের মাদবর সরকার সাব। মিয়া সাব। আর আছে মাতা গরম সত্তর বেপারী। এ্যাগো বুঝায় কে? এরে বিয়া করলে সালিশ ডাকবো। কি যে অয়। আল্লাহ জানে।

হ। আল্লারে ডাক। আর নমাজও পইরো।

তুই দেহি ভগবান থুইয়া আল্লাহ আল্লাহ শুরু করলি।

আমি হিন্দুর মাইয়া সত্যি। তয় ছোট জাত। তারপর আবার বাজারী মাইয়া মানুষ। আমার আর ধম্মো অধম্মো জাত পাত কি? চোখ বুজলেই জোড়া ঘরের ছবি ভাইস্যা উঠে। দুয়ারে খরের পালা, আথালে গরু। উঠোন ভরে মুরগীর কক্কক্। পেটের ভেতর নড়াচড়া। বেপারী আমারে তুমি ঘর দাও; সংসার দাও। চাপা কান্নায় ভেঙ্গে পরে চিতরংগী জলিল বেপারীর মাছের গন্ধভরা বুকের চৌকাঠে। চিতরংগীর মাথার তেলচিটে কালো চুলে বেপারীর ছাল উঠা পাঁচটি আঙ্গুল শান্তনার খেলা খেলে। জানি না। কিচ্ছু জানি না। শুধু জানি তুই আমার বউ। বাছ।

বুকের ভেতর চিতরংগীর ফুঁপানি কমে আসে। কাদামাটির পুতুলের মত সে বেপারীর বুকে লেপটে থাকে। বৃদ্ধা রাধাচূড়ার গাছে সরসর করে কাঠবিড়ালী দৌড়ে যায়। দূরে কোথায় পেঁচা ডেকে উঠে। কুপি বাত্তি নিভে যায়। দুটি স্বপ্নাতুর মানব মানবী আদিম খেলায় মেতে উঠে।

পোয়াতি শষ্যের পেটে আগামীর হাসি। চিতরংগীর পেটের শিশুটিও সে হাসিতে যোগ দেয়। জৈষ্ঠ শেষের বৃষ্টির চাড়ালে ফোটা ফজলার মুখে পড়তেই দেখে পশ্চিমের আকাশ ফরসা হয়ে গেছে। গামছাটি মাথায় পেচিয়ে কাস্তে হাতে ফজলা বাড়ীর পথ ধরে। আজই ধান কাটতে হবে।

৪ ভালবাসার প্রথম প্রহর

আমার বাসর রাত হবে ফুলে ফুলে ভরা। আক্ষরিক ফুল শয্যা। তোমার গা জুড়ে থাকবে ফুলের গহনা। সাতটি অমরাবতীর পুষ্পিত পারিজাতের সৌরভের ভেতর আমি তোমায় একটু একটু করে আবিস্কার করবো। আর বিস্ময়ে অভিভূত হবো। তোমার কানে দুলবে দোপাটি ফুলের দুল। আমি সে দোপাটির দোদুলের মধ্যে তোমার কর্ণলতিকায় ছোট্ট করে ভালবাসার ছোঁয়া দেব। তোমার গলায় থাকবে চন্দ্রমল্লিকার চন্দ্রহার। তোমার রজতশুভ্র পাহাড়ের সানুদেশে সে চন্দ্রহার ধবলগিরির রজতছটা নিয়ে ঝিকিমিকি খেলবে। আমি সেখানে আমার ঝলসিত মুখ রাখবো। তোমার বুকের গহীন মানসসরোবরে ফুটবে যে পদ্ম। আমি সে বিষহরা নীলকমলের মাঝে আমার রক্তাক্ত হৃদয় রাখবো। তোমাকে আমি একটু একটু করে আবিস্কার করবো। তোমার সিঁথিতে থাকবে লাল গোলাপের টিকলি। ললাট শীর্ষে পরাগের টিপ পরাবো। হাতের কংকন হবে বকুল ফুলের। কোমড়ের বিছা হবে কামিনী ফুলের। রক্তকরবীর মালা হাতে তুমি বসে থাকবে অমল ধবল ফুলের বিছানার ঠিক মাঝখানটিতে। তোমার নিঃশ্বাসে বেরুবে গোলাপ, গন্ধরাজ, বেলী বকুল, চাঁপার মিষ্টি সুবাস। তোমাকে আমি ফুলের ভেতর আবিস্কার করবো ফুলের মত করে।

এতেক বলিয়া যবে থামিলেন কবি। প্রেয়সী তাহার রমনা লেকের ধারে চিনে বাদামওয়ালার সাথে দুই টাকার বাদাম এতো কম কেন? বলে বাঁধালেন সমর। কসম তোমার পরওয়ারদিগার। সাক্ষী থাইকো রমনার বটমূল। এই দিলাম আমি মরন যমুনায় ঝাঁপ। বলিয়াই প্রেমিক আগালেন বেগে। ল্যাং মারিয়া প্রেমিকা তাহাকে ফেলিয়া দিলেন ভূতলে।

নূরজাহান আপা যেতে বলেছেন। মহিলা সমিতির কাজ আছে। মাকে বলে বাড়ী থেকে বের হলে খুকু। পাড়ার রিকসাওয়ালারা ওকে চেনে। কথাকলি স্কুলের সর্বকনিষ্ঠা টিচার স্বস্তিকা সাহাকে কে না চিনে? মাঝে মাঝে রাজিয়া আপার নারীকল্যান চ্যারিটি কাজের বদৌলতে 'বিচিত্রায়' ওর নাম উঠে। সেদিন ও বিচিত্রা কেনে এবং সলজ্য হেসে আমাকে দেখায়। একটু হেটে একটি অপরিচিত রিকশা নিয়ে ঠিক দশটায় মতিঝিলে বাংলাদেশ বিমানের গেটে নামে খুকু। মুহুর্তে আমার প্রতিক্ষার বিরক্তি উবে যায়। ওকে নিয়ে অন্য একটি রিকশায়। হুড খোলতেই আত্কে উঠে বলে

না না না

অনুচ্চ কণ্ঠে বলে

আমার কোন ছাত্রছাত্রীর গার্জেন দেখে ফেলবে।

আমি অভিমান ভরে বলি

আমার মরার সময়ও তুই বলবি "এখন মরিসনা। একটু অপেক্ষা কর। আমি টিউশনিটা সেরে আসি। নয়তো ছাত্রীর গার্জেন রাগ করবেন।"

মিষ্টি হেসে নরোম চোখে তাকায় খুকু।

খুকুর সাথে আমার পরিচয় একাত্তরের এপ্রিলে। ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা লোকজন বুড়িগঙ্গা পাড় হয়ে আশ্রয় নিয়েছে জিনজিরায়। এর মধ্যে পুরানো ঢাকার হিন্দুরাই বেশী। যেদিন পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী চারদিক ঘেরাও করে জিনজিরায় আগুন লাগিয়ে দিল। সেদিন ওদের দলটির সাথে আমার পরিচয়। আমি এবং আমার বন্ধুরা ওদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব নেই। তারপর সীমানা পেরিয়ে খুকুরা তিন বোন প্রথমে যায় জামসেদপুর। পরে কোলকাতায়। আমরা আগড়তলায়। জীবন ও মৃত্যুর সাথে খেলে, রক্ত ও ঘামের মধ্যে নেয়ে, ভুলেই যাই স্বস্তিকা সাহা নামে কোন মেয়ের কথা।

স্বাধীন বাংলায়, ৭২-এর প্রথম দিকে, ঢাকায় যে কটা সাপ্তাহিকীর জন্ম হয় "জাগ্রত জনতা" তার একটি। এতে ভীড় করেন বেশ কিছু তরুন প্রগতিশীল কবি ও সাংবাদিক। লেখা ও আড্ডা চলে গভীর রাত অবধি। জগন্নাথ কলেজ ও বাংলা বাজার কাছে হওয়ায় মাঝে মাঝে প্রবীন ও প্রতিষ্ঠিত কবি সাহিত্যকরাও ঢু মারেন। এভাবেই জাগ্রত জনতার তিন কামড়ার ছোট্ট অফিসটি লেখক সাংবাদিকদের প্রিয় আড্ডায় মুখরিত হতে থাকে। গভীর রাতে বেশামাল অবস্থায় আড্ডা দিতে আসেন নির্মলেন্দু গুন। সাথে আবুল হাসান। চলছিল ভালই। কিন্তু মহিলা সম্পাদক নেই। মীনাপা ও ফানু এই দুই বোন মিলে কাজ চালিয়ে নিচ্ছিলেন। তবু একজন স্থায়ী মহিলা সম্পাদকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অতঃপর মহিলা সম্পাদক হয়ে যিনি আসেন তিনিই কুমারী স্বস্তিকা সাহা। আমাদের খুকু।

প্রথম দিনের সৌজন্য সাক্ষাতে আমরা অপরিচিতের ভান করি। অফিস শেষে রাত নটায় ওকে বাসায় পৌছে দেবে কে? অফিস প্রায় খালি। বসে আছি শুধু আমি। অগত্যা সম্পাদক সাহেব বলেন, আজাদ আপনি ওকে বাসায় পৌঁছে দেন। বাসাটাও চিনে আসেন। রিকশায় উঠে আমরা দুজন অনেক্ষণ ধরে হাসি।

জাগ্রত জনতায় আমার কাজ ছিল শেষের পাতার একটি কলাম লেখার। কলমটির দুটো নাম ছিল "এলোমেলো ভাবনাগুলো" ও "চলমান দৃশ্যাবলী"। কলামটি জনপ্রিয় ছিল কিনা জানিনা তবে আগ্রহ নিয়ে লোকে পড়তো এ তথ্যটি জানা ছিল। রাজনীতির উম্মাদনায় আমি তখন ছন্নছাড়া। আছে ছোট্ট একটা চাকুরী। "গণভোরে" উপসম্পাদকীয় লেখা সপ্তাহে একদিন এবং পড়াশুনা। অনিয়মের সীমা এতোটাই ছাড়িয়ে যায় যে, শরীর আর বইতে রাজী হয় না। আক্রান্ত হই রোগে। মিটফোর্ড হাসপাতালের সুন্দর কেবিনগুলির একটি দেয়া হয় আমাকে। দেয়া না। বলা উচিত দিতে বাধ্য করা হয়। নার্স রাধাদির নিবেদিত নিপুন সেবা। বন্ধুদের উদ্বিগ্ন মুখ। প্রতিটি বিকেল খুকুদের তিন বোনের কলহাস্যে ভরে উঠতো আমার কেবিনটি। অস্তগামী সুর্য্যের মিলিয়মান আভায় মিটফোর্ডের লাল দালান থেকে বুড়ী গঙ্গার অপরূপ নৈসর্গিক শোভার সাথে খুকুর ছোট বোন মৃদুলার সুরেলা গলার রবীন্দ্র সংগীত। এক দুর্লভ স্বপ্ন সুখে ভরে দিত আমার অসুস্থতার দিনগুলি।

প্রেম! ছো! সেতো করবে ডগিতবলা পট্টির লাল্লু মার্কা ছেলেরা। আমরাতো শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের অগ্রসৈনিক। তাই আঁখি বা বকুল দেশাইরা বিপ্লবের সহযোদ্ধা বই অন্য কিছু নয়। নারীর কমনীয়তা বা নমনীয়তা আমাদের ত্রিসীমানায় ঘেসতে পারে না। এক কমরেড সেভ করে ক্রীম মেখেছিল বলে আনু ভাই তাকে ডেকে কষে বকুনি দিয়ে আমাকে একলা পেয়ে বললেন "ওকে দিয়ে বিপ্লব হবে না। তুমি ওর দায়িত্ব নাও।" এমতাবস্থায় খুকু শুধু সহকর্মী বন্ধু ছাড়া আমার অনুভবে আর কিছু নয়। যদিও ওকে প্রায়ই বাসায় পৌছে দেই। হুডখোলা রিকশায় চিনাবাদাম চিবুতে চিবুতে বিপ্লব করি। জানি আমি সে ডগিতবলা পট্টি সমর্থক। তবু আঁকড়িয়ে ধরার খুকুর সে কি ব্যকুলতা। আর বিপ্লবের নেশায় আমার অমনোযোগীতা অর্থাৎ পরোক্ষ অবহেলা। ওকে ধীরে ধীরে মুকুলের প্রতি ঠেলে দেয়।

মুকুল মার্জিত রুচির হ্যান্ডসাম টেলেন্টেড ছেলে। তবু কেন জানি ওকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হয় না। মুকুলকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। আমি চলি আপন বেগে পাগল পারা। বোহেমিয়ানের চুড়ান্ত অবস্থা। এর মধ্যে এক কান্ড ঘটে গেল। কে যেন ইনভিজিবল কালিতে আমায় হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠায় জাগ্রত জনতা অফিসে। সে চিঠি পড়ে খুকুর হাতে। আমি তখন পার্টির কাজে ঢাকার বাইরে। অনেক চেষ্টায়ও খুকু চিঠিটি পড়তে না পেরে বিরক্ত হয়ে কোনায় আগুন ধরিয়ে দিতেই লেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। চিঠি পড়েতো খুকু "থ"। ঢাকা এসে খবর পেয়ে ছুটে যাই ওদের বাসা। সে এক বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার। অফিসে তো এতোদিন আসেই নাই। নাওয়া-খাওয়াও বাদ দিয়েছে। আমাকে দেখে লাজলজ্যা ভুলে সবাইকে উপেক্ষা করে যা করলো খুকু তা ইমোশনালের চুড়ান্ত। মনে মনে বলি সব মেয়েইতো ক্রোপস্কায়া নয়। নারীর মোহমায়া হচ্ছে বিপ্লবের বাঁধা। একি আমার প্রতিবিপ্লবী দুর্বলতা? নাকি মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী চরিত্রের উঁকিমারা? তত্ত্বের চাবুকে নিজেকে চাবকাই।

খুকুর মা ও ছোট ভাই বোনদের কাছে সব পরিস্কার হয়ে যায়। মল্লিকা জানতে চায় কেন আমরা বিয়ে করছি না? মাসিমা আমার মাথায় হাত রেখে স্বগোক্তি করেন
"কি করি এখন।"
এক কাপ চা গলায় ঢেলে মাথা নীচু করে চলে আসি।

এ এক অস্থির সময়ের দিনলিপি। যুদ্ধ ও মৃত্যু। এক নদী রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা। বড় বেশী চড়া দাম দিতে হয়েছে স্বাধীনতার জন্য। তাই চাহিদা ও আকাশচুম্বী। বিভ্রান্ত তরুণ সমাজ। উচ্চাভিলাশ আকাশ ছুঁইছুঁই। বিত্তবানরা আরো বিত্তের লোভে, উচ্চবিত্তরা উচ্চতর বিত্তের সন্ধ্যানে। মধ্যবিত্তরাও ইঁদুর দৌড়ে পিছে নেই। নিম্নবিত্তরা রশি ধরে টানছে ওদের নীচে। সীমিত সম্পদ, সীমাহীন চাহিদা। ক্ষুব্দ যুদ্ধ শেষের শ্রান্ত মানুষ। ক্যামোফ্লাজ হয়ে যাওয়া স্বাধীনতার শত্রুরা স্যাবোটাজ করে এ ক্ষুধার অনলে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে। একদিকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উচ্চকিত শ্লোগান। অন্য দিকে পদ্মা মেঘনার শান্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঢেউ। অশান্ত করে তুলছে রাজনৈতিক অঙ্গন। সাহিত্যে ও লেগেছে অস্থিরতার ছোঁয়া। সংসদে অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দিনের বাজেট পেশের সময় রফিক আজাদ লিখলেন কবিতা। “ভাত দে হারামজাদা নইলে মানচিত্র চিবিয়ে খাব।” কবিতাটি আমাদের সবার মুখে মুখে। বাংলাবাজার, পল্টন, টিএসসি মোড়, বাংলা একাডেমীর বটতলা।” হুলিয়ার দিন শেষ। এ সময় দাউদ হায়দার ফাটালেন আরেক বোমা। সংবাদে বেরুলো তার সেই কবিতা। সুরাইয়া খানম আবুল হাসানকে বগলদাবা করে হুডখোলা রিকশায় সিগারেট ফুঁকে চক্কর দিচ্ছেন শাহবাগ এলাকা। কবির আনোয়ারের তোলপাড়। অরুনোদয়ের অগ্নিসাক্ষী করে জয়শ্রীকে নিয়ে সীমানা পেরিয়ে আলমগীর কবির। আব্দুল্লাহ্ আল মামুনের এখন দুঃসময় মুখোমুখি যখন আমরা তখন অতিদ্রুত দিন বদলের পালে এতো প্রবল ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা লাগে যে মধ্যবিত্তের জীবন পাল্টে যেতে থাকে নিমিষে। এ পরিবর্তনের ইঁদুর দৌড়ে যারা পিছিয়ে পড়ে তারা হতাশ হয়ে ভীড় করে পরাজিত শক্তির ছায়ায় অতিগোপনে ভূতলে।

ভাবনা বারন মানে না। ৭৪-এর বাংলাদেশ। রাজনৈতিক সন্ত্রাস, প্রকাশ্য হত্যা, গুম খুন, সিরাজ শিকদারের উত্থান। ভয়াবহ অরাজকতা। এ অবস্থায় কখন দিন যায় রাত হয় নিজেই জানি না। তবু মনে পড়ে। সজল দুটি ডাগর চোখের নিস্পাপ মায়াবতী মুখ মনে পড়ে। কিন্তু দেখা হয় না। প্রকাশ্য ঘুরাফিরা প্রায় বন্ধ। এভাবে কদিন চলে? তাই একদিন উঠন্ত সকালের নির্জনতায় মুখোমুখি হই দুজনে। খুকুকে আবিষ্কারের নেশায় আমি তখন সব ভুলে যাই। ভুলে যাই পারিপার্শ্বিকতা। ভুলে যাই মাথার উপর লাল সিগন্যালের কথা। স্থির করি অগ্নিকুন্ড থেকে খুকুর শীতল সাগরে ডুব দেব অমৃতের সন্ধানে। ভুলে যাওয়া কবিতার লাইন মনে পড়ে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভালবাসার স্তব আউরিয়ে যাই:

খুকু
আমার খুকু
তোমাকে চাই
শুধু তোমাকে চাই।
আমার অনুচ্চ অস্পষ্ট কথা ছাপিয়ে ওর মৃদু কণ্ঠ বাতাসে ঢেউ তুলে
মুকুলকে কি জবাব দেব?

আমার কানে সহস্র নিউক্লিয়ার বোমা ফাটে। আমি ভালবাসার প্রথম প্রহরে জেগে উঠতে পারিনি। ততদিনে বুড়ীগঙ্গার অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। খুকু অনেক দুর চলে গেছে। আমার দেবদাস হওয়া হয় না। আমি না প্রেমিক হই, না বিপ্লবী। আমি শুধু নীল বেদনায় ফ্রিজড হয়ে যাই।

৫ খোঁজ

নতুন একটি ওয়েব সাইটের সন্ধান পেয়েছে শুভাশীষ গতরাতে। কিন্তু ক্লিয়ার ধরতে পারছে না। এ নিয়ে সে ব্যাস্ত। তার আম্মু বুড়িয়াপ্পা ঘরে কয়েকবার এসে ফিরে গেছে ছেলেকে নিমগ্ন দেখে। শুভাশীষের ও জেদ্ চেপে গেছে। ধরতে তাকে হবেই। নাওয়া-খাওয়া বাদ। আম্মু এক প্লেট স্যান্ডউইচ ও একটি পেপ্‌সির বোতল রেখে নিজের কাজে মন দিয়েছেন। শুভ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্ক্রীনে। হাত মাউসে ঘুরছে স্বয়ক্রিয় রোবটের মত। এতোখানি নিমগ্ন যদি সে পড়াশুনায় হতো তাহলে পরীক্ষায় একটা ফাটাফাটি রেজাল্ট করে ফেলতো। কিন্তু না। পড়ার টেবিলে তার মন নেই। মন তার কম্পিউটারে। নতুন নতুন ওয়েব সাইটের ডট কম - এ নতুন নতুন এ্যাডভেঞ্চারে। "বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র থেকে।" রবি ঠাকুরের গানটার সাথে মিলে যাচ্ছে ওয়েব সাইটের বায়ুবাহিত শব্দতরঙ্গ। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে সাগর তীরের খুব কাছের কোথাও থেকে কেউ খুঁজছে কাউকে। শব্দটা ধীরে ধীরে ক্লিয়ার হয়ে আসছে সাথে ছবিও। সমুদ্রের গর্জন থেমে গেছে। সাগর এখন শান্ত। শুভ শান্ত থাকতে পারছে না। তার উত্তেজনা বাড়ছে। সবুজ - সবুজ। যেদিকেই ক্রুজার ঘুরাচ্ছে শুধু সবুজ-সবুজের মেলা। ধীরে ধীরে সবুজ ফুটে বেরিয়ে আসছে একটি সাদা মেয়ে। সবুজ কুড়ি থেকে যেমন ধীরে ধীরে দল মেলে বেরিয়ে আসে পরিপূর্ণ গন্ধরাজ। সে রকমই গন্ধরাজ ফুলের মতই একটি মেয়ে ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো গাঢ় সবুজের ছায়াময় পরিবেশ থেকে। ধন্য ইন্টারনেট!

ঃ হাই নিউ ফ্রেন্ডস। আই এম আফিয়াদিতি। ফ্রম ক্রীট্‌স আইল্যান্ড অব গ্রীস। ডু ইউ নো গ্রীস? দ্যা এ্যানশেন্ট সিভিলাইজ্‌ড কান্ট্রি ইন দ্যা ওয়ার্ল্ড।

বন্ধ হয়ে গেল কথা। সাথে সাথে ছবিও মিলিয়ে গেল স্ক্রীন থেকে। শুধু শোঁ শোঁ শব্দ। মাথাটা চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে হাত-পা ছেড়ে শুভ চেয়ারেই ধপ্ করে শুয়ে পড়ল।

আবার শুরু হল খোঁজার পালা। ক্লান্তিহীন নিদ্রাহীন শুভাশীষ তার ক্ষনিক দেখা বন্ধুকে খুঁজতে লাগলো অবিরাম। এবার তাকে বেশী সময় ব্যয় করতে হলো না। কষ্টও না। পেয়ে গেল সহজেই। আফিয়াদিতি এখন রেডি হচ্ছে বাইরে বেরুনোর জন্য।

ঃ হাই ফ্রেন্ড! আই এ্যাম গোয়িং টু স্কুল। হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেল সে।

নীল জীনস মিলিয়ে যেতেই গাড়ী ষ্টার্টের আওয়াজ ভেসে এলো ইথারে। আবার সেই একটানা সামুদ্রিক শোঁ শোঁ শব্দ। তারপর নিরবতা।

দীর্ঘদিন আব্বুর একটি গ্রীক কোম্পানীতে চাকুরী করার সুবাদে ওদের ফ্যামিলির সাথে অনেক গ্রীক ফ্যামিলির জানাশুনা ছিল। সে কথা মনে হতেই শুভ ছুটে গেল আম্মুর কাছে গ্রীস সম্বন্ধে জানতে। "মেনল্যান্ড ছাড়া ছোট বড় অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে গ্রীস রাষ্ট্র। রোডস, ক্রীট, ইথাকা প্রভৃতি হলো বিখ্যাত দ্বীপ। গ্রীক মহাকবি অন্ধ হোমার সম্ভবত: ইথাকার অধিবাসী ছিলেন। তার মহাকাব্য 'ইডিপাসে' ইথাকার উল্লেখ আছে। ক্রীট ও রোডস ও ইতিহাসখ্যাত আইল্যান্ড। রাজধানী এথেন্স প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের জন্য বিখ্যাত হওয়ায় পর্যটকদের আকর্ষণীয় শহর।" মায়ের কাছে গ্রীসের কথা শুনে একটা ধারণা পেল শুভ।

আবারো সেই সমুদ্রের ডাক। সুরের হাতছানি। আফিয়াদিতি ভেসে উঠলো ওয়েব সাইটে। এভাবেই সুন্দরের দেবী আফ্রোদিতির এক অধঃস্থন বংশধর বঙ্গের এক অষ্ট্রিক অধঃস্থন বংশধরের সাথে বন্ধুত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে গেল। সে কোন সুদূর অতীতে গ্রীক বীর আলেকজান্ডার প্রাচীন ভারতীয় রাজা পুরুকে শুধু রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েই কি আলেকজান্ডার ফিরে গিয়েছিলেন? বিনিময়ে কি? শুভর সাথে আফিয়াদিতির এ বন্ধুত্বের রোমান্সের কিছু নেই। আছে নির্ভেজাল এ্যাডভান্সারিজম। একে অপরকে জানার। নিজ দেশকে জানা। অন্যের দেশ সম্বন্ধে কৌতুহল। নিজের সময়কে স্মৃতিতে ধরে রাখার চেষ্টা। এ চেষ্টার যেন শেষ নেই। আফিয়াদিতি শুনায় প্রাচীন গ্রীসের কথা। গ্রীসের স্থাপত্য মানুষজন ও বীরত্বের কথা। প্রাচীনতম সভ্যতার দেশ গ্রীস। সম্ভবতঃ প্রাচীন ব্যাবেলনীয় সভ্যতার পরই আসে গ্রীক সভ্যতার কথা। মিশরীয় সভ্যতাকে গ্রীক সভ্যতা থেকে একেবারে আলাদা করে দেখা যায় না। আলেকজান্ডার, টলেমী, ক্লিউপেট্রা এরা সবাই একই সাম্রাজ্য বা সভ্যতার ফসল। আলাদা করে দেখা যায় না। আজো মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় বা অন্য কোন অঞ্চলের খৃষ্টান অধিবাসীরা আরবীর সাথে গ্রীক ভাষায়ও কথা বলে। বলা যায় তাদের

ঘরের ভাষা গ্রীক। বাইরের ভাষা আরবী। আরবী সভ্যতা অনেকখানিই ঋণী গ্রীক সভ্যতার কাছে। শুভ একদিন জিজ্ঞেস করেছিল -

ঃ আফিয়া তো আরবী নাম। তোমার নাম আফিয়া হলো কি করে?

উত্তরে ওর বন্ধুটি জানিয়েছিল-

ঃ আরবী ভাষা আমার ভাল লাগে। আফিয়া অর্থ সুস্বাস্থ্য বা সুস্থ থাক। ভাল থাক। এ রকম অর্থ। তার সাথে দিতি যোগ করে নামের বৈচিত্র আনার চেষ্টা করেছি। যার ফলে আমার নাম হয়ে গেছে আফিয়াদিতি।

শুভরও ভাল লেগেছে নামটি। তাই অনেকগুলি ওয়েব সাইটই বন্ধ করে দিয়েছে সে। রেখেছে শুধু আফিয়াদিতিকে। দু'জনে গল্প করে। আফিয়া শুনায় গ্রীক পুরাণের কথা, হোমার, ইডিপাস, অডিসির কথা। গ্রীক দেব দেবী, গ্রীক গণতন্ত্র। এথেনার নগর রাষ্ট্রের কথা। শুনায় সক্রেটিস এরিষ্টোটলের কথা। অপর দিকে শুভ শুনায় প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস, জ্ঞানের কথা। শুনায় মহাজ্ঞানী অতীশ দীপংকরের কথা। বাংলা ভাষার আদি কবি কাহ্নপাদ, ভুসুকুর কথা। শুনায় বিভিন্ন ধর্মের বিচিত্র জাতি সত্ত্বার মহা মিলনের তীর্থের কথা। এভাবে শুনাতে শুনাতে শুভ একদিন তন্ময় হয়ে শুনায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা। শুনায় শান্ত শিষ্ট ঘরকুনো বাঙালীর অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার সেই ভয়ংকর অথচ করুণ দিনগুলির কথা। শুনতে শুনতে আফিয়াদিতি অভিভূত হয়ে যায়। এভাবেই এসে যায় একদিন মার্চ মাস। শুভ বড় বিক্ষিপ্ত চঞ্চল হয়ে উঠে এ মাসটিতে। আফিয়াদিতির কান এড়ায় না। চোখ বিভ্রান্ত হয় না। সে ধরে ফেলে শুভর এ ভাবান্তর। তার চিত্তের চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা। চেপে ধরে সে শুভকে। শুভ তখন শুনায় তার বন্ধুকে এক অপার্থিব কাহিনী। এক মঙ্গলময় বার্তা। এক অসময় ভয়ংকর যুদ্ধের কথা। শুভ শুনায় ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর পুরো ভাষণটা। স্থির অচঞ্চল সমাহিত হয়ে আফিয়াদিতি শুনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষণ। দীর্ঘক্ষণ পরে দুজনেরই যখন তন্ময়তা কেটে যায় তখন দূর থেকেও একটি আত্মিক একাত্মবোধ করে দুজনেই।

১৯৭১ সন। একদিকে ধ্বংস ও মৃত্যুর হোলিখেলা অন্য দিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা। একাত্তরটা হচ্ছে বাঙালীর জাতীয় জীবনের টার্ণিং পয়েন্ট। "এবার ফিরাও মোরে" এই বলে সকল আবিলতা ও হীনমন্যতাকে ঝেড়ে ফেলে বিশ্ব সভ্যতার সাথে পথচলা। এ আলোর পথের সন্ধান দিয়েছেন আমাদের, বিশেষ করে আমাদের প্রজন্মকে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান।

ঃ আমি কি তোমাকে বুঝাতে পারলাম আফিয়াদিতি?

ঃ এ পর্যন্ত বুঝলাম। কিন্তু পরেরটুকু বুঝলাম না।

ঃ পরেরটুকু কি?

ঃ তোমরা। তোমাদের জাতির পিতাকে হত্যা করলে কেন?

শুভ 'থ' হয়ে গেল আফিয়াদিতির প্রশ্ন শুনে। একটু থিতু হয়ে বিষন্ন গলায় বললো-

ঃ এ প্রশ্নের উত্তর আমারও জানা নাই। উত্তর আমি খুঁজছি। না পাওয়া পর্যন্ত অনন্তকাল খুঁজবো।

ঃ তোমার এ খোঁজার সাথী কি আমি হতে পারি না?

ঃ হ্যাঁ; পারো। তবে শুধুই খোঁজার সাথী। অন্য কিছু না।

আফিয়াদিতি হেসে জবাব দিল-

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। আফিয়াদিতির খবর নেই। মাঝে মাঝে দেখা যায় সকালে সে বেরিয়ে যাচ্ছে তার ছোট গাড়ীটা নিয়ে। কখন ফিরছে শুভ সে দৃশ্য ধরতে পারছে না। "মহা জ্বালা"। এ বলে শুভ পড়ায় মন দেয়। কিন্তু কিছুতেই আফিয়াদিতিকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না মগজ থেকে। ঘুরে ফিরে মগজের বন্ধ জানালায় টোকা দেয়। বেশ কয়েকমাস কেটে গেল এভাবে। শুভ ব্যাস্ত হয়ে গেল তার একজাম নিয়ে। পরীক্ষা শেষে একদিন কম্পিউটার অন করতেই ভেসে এলো আফিয়াদিতির কণ্ঠ।

ঃ হাই শুভ। আমি আসছি।

ঃ আসছি? কোথায় আসছ?

ঃ শেখ মুজিবের দেশে।

ঃ শেখ মুজিবের দেশে! মানে? বুঝতে পারছি না।

ঃ যাঃ আঃ বুদ্দু কোথাকার। তোমাদের দেশে। মানে বাংলাদেশে।

ঃ ও-য়া-ও-ও !

এক লাফে শুভ চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে গেল। খুশীর চোটে একপাঁক ঘুরেই দৌড় দিল তার আপু স্বাতুলাকির ঘরে।

ঃ আপুলি! ও আসছে!

ঃ কে?

ঃ ও আসছে!

ঃ কে? আসছে ! আরে বাবা ! বলবি তো কে আসছে।

ঃ ঐ - আফিয়াদিতি - ।

ঃ তোর সেই বন্ধু।

ঃ ই-য়ে-স।

ঃ ও-য়া-ও-ও। বেশ মজা হবে। নাও গেট রেডি।

বলেই সে তার মাইক্রো ইকোনমিক্সের বইয়ের পাতায় মন দিল। কাল তার পরীক্ষা।

ডিসেম্বরের নির্মল আকাশ। নিস্তেজ সূর্য নরোম আলো ছড়িয়ে দিয়েছে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে। সকালের সোনাঝরা রোদ মিষ্টি ওম দিচ্ছে শরীরে। ওরা দুই ভাই-বোন দাঁড়িয়ে আছে এ্যারাইভেলের অভ্যর্থনায়। অলিম্পিক এয়ার লাইন্সের বৃহদাকার এয়ারবাস প্লেনটি বিকট আওয়াজ তুলে ল্যান্ড করলো এখুনি। একটু পরেই বেরিয়ে আসবে আফিয়াদিতি। “কেমন হবে মেয়েটা?” দুজনেই চমকে উঠলো দুজনের কথা শুনে। “ঐ তো আসছে - ঐ তো আসছে - আফিয়া।”

নীল জিন্‌স ও লাল টপ্‌সের উপর একটি জ্যাকেট গায়ে, পিঠে ব্যাগ, হাতে টানা ট্রলি এ্যাটাসির হ্যান্ডেল এক হাতে, অন্য হাতে একগুচ্ছ সবুজ অলিভ পাতা নিয়ে এগিয়ে আসছে আফিয়াদিতি গেটের দিকে। এয়ার পোর্টের হাজার হাজার অভ্যর্থনাকারীদের মাঝ দিয়ে এগিয়ে এলো বিদেশিনী শুভদের দিকে। ওরা দুই ভাই-বোন দুদিক থেকে জড়িয়ে ধরল ১৪/১৫ বছরের কিশোরীটিকে।

ঃ কালিমারাসাস (সুপ্রভাত)। - মিষ্টি করে হেসে বলল আফিয়াদিতি।

ঃ কালিমারাসাস (সুপ্রভাত)। - বলে ওরাও প্রতিউত্তর করলো।

ঃ হাউ ইউ নো গ্রীক? - অবাক প্রশ্ন আফিয়ার! পেরেমিনে (অপেক্ষা কর) - পেরেমিনে (অপেক্ষা কর)।

ঃ তিকানিস (কেমন আছ)? - আস্তে বললো শুভ।

ঃ কালা (ভাল)? - প্রশ্ন শুনে চোখ দুটো ভাগ্যকুলের রসগোল্লার মত করে আফিয়া তাকালো স্বাতুলাকির দিকে?

ঃ পলিকালা (খুব ভাল) - হাউ ইয়্যু নো অ্যা?

কথা বলতে বলতে ওরা গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলো। ওদের ছোট্ট মারুতি সুজুকী গাড়ীটি এগিয়ে চললো মনিপুরের দিকে।

ঃ তোমরা গ্রীক ভাষা শিখলে কি করে? এটা বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষাগুলির একটি। বেশ কঠিন। শিখলে কি করে?

ঃ তোমাকেও বাংলা ভাষাটা শিখিয়ে দেব - চিন্তা করো না। - স্বাতুলাকি আশ্বস্ত করলো আফিয়াদিতিকে।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছেন বুড়িয়াপ্পা পথের দিকে চেয়ে। “এখনো আসে না কেন ওরা?” স্বাতুলাকির রুমটাতেই সিঙ্গেল খাট দিয়ে নতুন একটা বেড লাগিয়েছেন তিনি। সাথে একটা ওয়ারড্রপ। ড্রেসিং টেবিলটা দুজনে শেয়ার করবে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে দুদিন খেটে খুটে সুন্দর করে সাঁজিয়েছেন রুমটাকে। এক রাশ লাল-সাদা গোলাপ ও চন্দ্রমল্লিকার কম্বিনেশনে একটি ফুলের তোড়া বানিয়ে এনেছেন ভাসানী স্কোয়ারের “মালঞ্চ” ফুলের দোকান থেকে। নতুন অতিথিকে বরণ করার আনন্দে ছেলেমেয়ের সাথে তিনিও শরীক হয়েছেন পাল্লা দিয়ে। তাই ঘর সাজানো থেকে আফিয়াদিতির সব রকমের আরাম আয়েশের ব্যবস্থা নিজ হাতে করছেন। বিদেশিনী যেন বাঙালী আতিথেয়তায় ত্রুটি খুঁজে না পায়। তবু তার শংকা কাটে না। কি থেকে কি হয়। “শয়তান। সারা জীবন আমাকে জ্বালিয়ে খেল।” প্রবাসী স্বামীর উদ্দেশ্যে অভিমানের ছড়ড়া ছুড়ে দ্রুত নীচে নেমে গেলেন। “ঐ তো ওরা আসছে।”

কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্টের বিকল্প। জুসের পরিবর্তে ঠান্ডা ডাবের পানি। জ্যাম বাটার টোষ্টের পরিবর্তে গরম চিতৈ পিঠাতে দানাদার ঝোলা খেজুরের গুড় দিয়ে ব্রেকফাস্ট উইথ ফিনলে তাজা চা। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর

তুলে গা এলিয়ে দিল সবাই। ব্রেকফাস্ট টেবিলেই জমে গেল ওদের খোশগল্প। গল্পের প্রধান বিষয় কত অল্প সময়ে আফিয়াদিতিকে গোটা বাংলাদেশটা দেখানো যায়। বুড়িয়াপ্পা আগেই ঢাকা শহরের দর্শনীয় স্থানগুলির একটা খসড়া ম্যাপ তৈরী করে রেখে ছিলেন। ছেলেমেয়েদের কলতানের ফাঁকে তিনি উঠে ম্যাপটি এনে টেবিলে মেলে ধরলেন। সবাই ঝুঁকে পড়লো ম্যাপের উপর। লালবাগের কেল্লা, পরীবিবির মাজার, ছোট কাটারা, বড় কাটারা হয়ে আহসান মঞ্জিল। তারপর এগিয়ে যাও সামনের দিকে। রমনাকালিবাড়ি। (যা এখন '৭১ পাক হানাদার বাহিনীর ক্রোধানলে নিশ্চিহ্ন।) সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, শিখা অর্নিবান, জাতীয় যাদুঘর, পাবলিক লাইব্রেরী, টিএসসির মোড়, অপরাজেয় বাংলা, মধুর ক্যান্টিন। "শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেখতেই তো একদিন লেগে যাবে মা?" স্বাতুলাকির উর্ধমুখের দিকে তাকিয়ে শুভাশীষ বললো, "আমরা বাতাসের আগে উড়বো। কিচ্ছু ভেবো না।" "তবু শেরাটন থেকে পর্যটনের একটা ম্যাপ নিয়ে নিও।" - আম্মুর মন্তব্য। গাড়ীর চাবি দুলাতে দুলাতে ওরা হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল ঢাকা শহরটাকে এক চক্কর ঘুরে দেখতে।

"১৬ই ডিসেম্বর আসছে। তাই ঢাকার বাইরে যাওয়া হবে না।" - ঘোষণা দিল স্বাতুলাকি। আফিয়াদিতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই শুভাশীষ বললো - "বাঙালী জাতির চরম আকাঙ্খিত দিন এটি। পরম প্রাপ্তির মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৬ই ডিসেম্বরের এই দিনটি। এ দিনেই রমনা রেসকোর্স ময়দানে পরাজিত পাকিস্তানী শক্তি আত্মসমর্পনের দলিলে সাইন করেছিল টাইগার নিয়াজীর নেতৃত্বে।" "টাইগার আবার পরাজিত হয় কি করে? মালাকা (গ্রীক পঁচা কথা)। টাইগার হয় মারে নয় মরে?" - শ্লেষ আফিয়াদিতির কণ্ঠে। "ওটা লেজ কাটা বাঘ।" আরো সুন্দর করে বলতে পার বাঘের ছাল গায়ে লেজ কাটা শেয়াল। অনেক হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া করে শোরগোল পাঁকিয়ে তুলেছিল ন'টি মাস। দোহারকি ধরার লোকের ও অভাব হয়নি। বিচ্ছুদের কেঁচকি মাইর খেয়ে গর্তে ঢুকেছিল এ দিনটিতে। তাই আমাদের কাছে ১৬ই ডিসেম্বর "মহান বিজয় দিবস।" বিজয় শুধু যুদ্ধেই নয়। বিজয় দাসত্ব থেকে মুক্তির। যে বিজয় বার্তা শুনিয়েছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঐ একই জায়গা থেকে ৭ই মার্চ।" লম্বা লেকচার দিয়ে শুভ যখন থামলো তখন ওদের আম্মু টিপ্পনি কাটলেন "বাপ্‌কা বেটা।" সবাই হেসে উঠলো এক সাথে।

বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সংগঠনের অনুষ্ঠান লেগেই আছে। কখনো শহীদ মিনারের পাদদেশে, কখনো রমনা বটমূলে, কখনো টিএসসির চত্বরে, কখনো শিশু একাডেমীতে, কখনো শিল্পকলা একাডেমীতে আবার কখনো বা বাংলা একাডেমীতে। জায়গাগুলি কাছাকাছি হওয়াতে ওরা হেটে হেটে গল্পে গল্পে সবগুলি অনুষ্ঠানই কভার করছিল। এক ফাঁকে ওরা দেখে এলো সভার জাতীয় স্মৃতি সৌধ। মিরপুরের শিয়ালবাড়ী বধ্যভূমি দেখাটা ওরা বাদ রাখলো। চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন হয়ে এক সময় ওটাও দেখে আসবে। বাড়ীর কাছেই তো। হাসি আনন্দ, ব্যস্ততা ও উৎসবের মধ্যে কেটে গেলে মধ্য ডিসেম্বর। আফিদিয়াতির বাংলাদেশ ভ্রমনের দিনগুলিও কমে আসছে। বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার না দেখিয়ে ওকে ছাড়ে কি করে? তাই ওরা দুই ভাই-বোন ধর্না দিল মায়ের কাছে।

ঃ আম্মু আমরা কক্সবাজার যাবো।
ঃ ঠিক আছে যাবে। তবে বড় কাউকে সাথে নিয়ে যাও।
ঃ আমরা তিনজনেই যাব। আমরা যথেষ্ট বড় হয়েছি।
ঃ আমি ভার্সিটিতে পড়ি। - স্বাতুলাকির অহংকারী কণ্ঠ।
ঃ আমরাও স্কুল ফাইনাল দিয়েছি। - শুভ আফিয়ার দ্বৈত কণ্ঠ।
ঃ সাহস থাকা ভাল কিন্তু দুঃসাহস নয়। - বুড়ীয়াপ্পার গম্ভীর মন্তব্য।

তবু ছেলেমেয়েদের জেদের কাছে তাঁকে হার মানতেই হলো। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের প্রথম দিনের সোনারোদ্দুরে তিনজন বেরিয়ে পড়ল কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে কমলাপুরের দিকে।
পর্যটনের "রূপালী" মোটেলটি ওরা ভাড়া নিল। সাগরের তীর ঘেসা সুরক্ষিত এ মোটেলটি একটি চাকমা মেয়ে দেখা শুনা করে। নাম তানচিং চাকমা। ফর্সা চামড়ার নাক চ্যাপ্টা মেয়েটি খুব স্মার্ট। ইংরেজী বাংলা দুটো ভাষাতে সমানতালে বকে যায় অনর্গল। প্রথমদিনেই তাজা রূপচান্দা ভাজা ও সাদা ভাত দিয়ে ওদের আপ্যায়িত করলো। ওদের সাথে বেশ ভাব জমে গেল মেয়েটির। ট্রেনের ধকল, বাসের ঝাঁকুনিতে ক্লান্ত ক্ষুদে পর্যটক দল ঘুমিয়ে গেল পেটপুরে খাওয়ার পরই।

আফিয়াদিতির ফ্রিনেসে ওরা প্রথমে একটু অস্বস্তি বোধ করলেও আফিয়াদিতিই শেষতক মানিয়ে নিল বাঙালী সংস্কৃতির সাথে। সে তার পাশ্চাত্য পোষাক ছেড়ে বাঙালী পোশাক ধরলো। সী বীচ কষ্টিউম ছেড়ে বাঙালী শালীনতায় নতি স্বীকার করে নিজেকে আবিস্কার করলো নতুন করে। সৈকতের লাল বালুতে সারাদিন, হৈ চৈ দৌড়াদৌড়ি করে ঝিনুক কুড়িয়ে ওরা বেশ কাটাচ্ছিল দিনগুলি। সাগর তো দেখা হলো। কিন্তু ঐ যে দূরে বন? ওটা ও যে দেখতে হয়। যেই ভাবা সেই কাজ। পরের দিন কাকডাকা ভোরে ডিমের কুসুমের মত সূর্য জাগার আগেই ক্ষুদে পর্যটক দল বেরিয়ে পড়লো জঙ্গলের উদ্দেশ্যে। ভাড়া করা জীপে চড়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ওরা এসে উঠলো মাটিরাংগা ফরেষ্ট বাংলোতে। চারিদিকে সবুজ। সবুজ আর সবুজ ছোট বড় পাহাড়। অন্যরকম পাহাড়ী মানুষ। অবাক করা চোখে ওরা দেখছিল এ ছোট্ট দলটিকে। বন যেন ডাকছে। পাহাড় যেন ডাকছে। ওরা এগুচ্ছে। বন যত ঘন হতে লাগলো বুনোবাতাসও তত ভারী হতে লাগলো। বাতাসের ভারী নিঃশ্বাস ওদের নেশা ধরিয়ে দিল। ওরা এগিয়ে চললো বেলছড়ি সীমান্তের দিকে। ওরা জানে না, ওরা কোথায় যাচ্ছে। কি ভয়ংকর বিপদের মধ্যে ওরা প্রবেশ করছে। বনমোরগের ডাক, আনারসের মিষ্টি গন্ধ, পাতার মর্মরধ্বনি, শুকনো পাতার মচ্‌মচ্‌ শব্দ, নিঝুম বনের মধ্যে নৈশব্দের ঐকতান বাঁজিয়ে চলছে। ধর্মরামপাড়া গ্রাম ছাড়িয়ে খেদাছড়া গ্রামের পাশ কাটিয়ে ওরা এগিয়ে চলছে আরো গভীর বনের দিকে। পথ আস্তে আস্তে সরু হয়ে আসছে, লোক বসতি পাতলা হয়ে আসছে। পথে মাঝে মধ্যে দু একজন বন্যকাঠুরে ছাড়া মানুষের দেখা মিলছে না। তবু এদের হুস নেই। আফিয়াদিতির ক্যামেরা বার বার ক্লিক করে যাচ্ছে। শুভাশীষ হাতে কাস্তে নিয়ে লতাগুল্ম সাফ করে পথ তৈরী করছে; স্বাতুলাকি বাইনোকুলার নিয়ে পাখি দেখায় ব্যস্ত। হঠাৎই স্বাতুলাকি চিৎকার করে উঠলো “লুক। লুক! এ্যা ম্যান রানিং আপটার সামথিং।” শুভাশীষ ও আফিয়াদিতি দৌড়ে এলো ওর কাছে। সত্যই একটা মানুষ। কি যেন খুঁজছে দৌড়ে দৌড়ে। “হাতে ওটা কি?” “অস্ত্রের মতই মনে হচ্ছে।” ওরা এগিয়ে চললো। বেহুশ এ পর্যটক দলটি আবিস্কারের নেশায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে দৌড়াতে লাগলো আধো দেখা মানুষটির পিছে পিছে। বেলছড়ি সীমান্ত ছাড়িয়ে ওরা ঢুকে পড়লো নো মেনস ল্যান্ড জোনে। অবশেষ ওরা ধরতে পারলো তাকে। সেই শতছিন্ন প্যান্ট শার্ট পড়া কিম্ভুতকিমাকার লোকটিকে। কৃশ দুর্বল লোকটি তিনটি তরতাজা কিশোর কিশোরীর কাছে হার মেনে বসে পড়লো। ঘোলাটে ভাবলেশহীন চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো স্মার্ট সুবেশী দলটির দিকে। ওরা লোকটিকে ঘিরে ধরলো। একের পর এক প্রশ্নবানে জর্জড়িত করলো অদ্ভুত লোকটিকে। কিন্তু তার মুখে কোন কথা নাই। কাঁচা পাকা চুল দাড়ির জংগলের ফাঁকে ঠোঁট দুটো শুধু বিড়বিড় করে নড়ছে। আর একটি অস্ফুট অদ্ভুত আওয়াজ বেরুচ্ছে। যার মাথা মুন্ডু কিছুই বোঝা যায় না। “আপনার নাম কি? বাড়ী কোথায়?” এ সহজ প্রশ্ন দুটির কোন উত্তরই দিতে পারছে না দুর্বল লোকটি। একসময় মাথা এলিয়ে শুয়ে পড়লো লোকটি ক্লান্তিতে।

বিপদ সংকেত বেঁজে চলছে বাংলাদেশ সীমান্ত ফাঁড়িতে। ওদিকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিএসএফ ক্যাম্পেও একই বিপদ সংকেত বাঁজছে। নো ম্যানস ল্যান্ডে কেউ ঢুকে পড়েছে। এ গভীর বনে একসময় ছিল শান্তি বাহিনীর আড্ডা। আজ সেই আড্ডা পরিণত হয়েছে ত্রিপুরার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ও আসামের উল্‌ফা গেরিলাদের অভয়ারণ্যে। আইএসআই এজেন্টরা ত্রিপুরার আদিবাসী গেরিলা ও উল্‌ফা গেরিলাদের ট্রেনিং দিয়ে পাঠাচ্ছে ভারতের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে উসকে দিতে। আর হরকত-উল-জিহাদ নামের আড়ালে বাংলাদেশে নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত আইএসআই। তাই সীমান্তের দুদিকের নো মেনস ল্যান্ডেই স্থল মাইন পুঁতে রাখা হয়েছে। স্থল মাইনের কথা মনে পড়তেই শংকায় লাফিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন আনিস। যদি কোন ইনোসেন্ট লোক ঢুকে থাকে তাহলে নির্ঘাত মারা পড়বে মাইন ফেটে। জলদি এক ট্রুপ সৈন্য নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন উদ্ধারে।

বুড়িয়াপ্পা কম্পিউটারের স্ক্রীনে চোখ রেখে বসে আছেন অধীর আগ্রহে। কত অজানারে ডট কম ওয়েব সাইটে তিনি নিয়মিত ওদের খবর পাচ্ছেন। কিন্তু আজ দুদিন হলো কোন ম্যাসেজ নেই। আফিয়াদিতির ব্যাটারী চালিত ছোট্ট লেপটপ কম্পিউটারটি অন্ নেই। বিপদাশংকায় মায়ের বুক দুরু দুরু কাঁপছে। অল্পেতেই নার্ভাস হন তিনি। এ খবর ছেলেমেয়েরা জানে তুব . . . . . ।

দাড়ি-মুছ-চুলের লম্বাজংগল দেখে চেহারাটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে কপাল চোখ ও গালের কিয়দংশ দেখে বোঝা যায় এক সময় লোকটি গৌরকান্তি ছিল। এখন রোদ-বৃষ্টি-জলে পুড়ে পুড়ে চামড়ার যে রং ধরেছে তা না গৌর, না পিত, না শ্যামল না কালো। তবে রূপোর কোন পাত্র না মাজতে মাজতে দীর্ঘদিন পর যে রংটি ধরে গায়ের রংটি তার তাই। পায়ের গুরালি চৈত্রফাটা জমির মত। হাত পায়ের নখ ইয়া বড়। "মানুষ" নামে অভিহিত করা একে এখন কষ্টকর। ওদের ফ্লাস্কে ছিল গরম কফি। ফুড কন্টেনারে কিছু স্যান্ডউইচ। তা খেতে দিল ওরা। প্রথমে একটু ইতস্তত করে লোকটি গোগ্রাসে গিললো উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য। কফি খেয়ে চোখ মেলে তাকালো। চোখের ঘোলাটে ভাবটা কেটে গেছে। দৃষ্টিতে ভয় নেই। আছে বিহ্বল বিস্ময়। শুভাশীষ এক পাশে ফেলে রাখা ওর চাইনিজ রাইফেলটি নেড়ে চেড়ে দেখছে। ওদিকে নজর যেতেই ছোঁ মেরে রাইফেলটি ছিনিয়ে নিল সে শুভর হাত থেকে।

ঃ আপনি কে? বাড়ী কোথায়? এখানে কি করছেন? হাতে রাইফেল কেন? শিকার করতে এসেছিলেন? পথ ভুল করছেন? - ইত্যাদি প্রশ্ন স্বাতুলাকি করেই যাচ্ছে লোকটিকে।

দীর্ঘ নিরবতার পর মনে হলো মুখ খুলছে লোকটি। কিন্তু গলার স্বর এতোই মৃদু যে এতো কাছ থেকে ও কিছুই শুনা যাচ্ছে না। তিন জোড়া কান লোকটির মুখের কাছে নুইয়ে এলো। দাঁড়ির জংগলের ফাঁকে কান পেতে ওরা অতি মৃদু স্বরে বিড়বিড় আওয়াজের মধ্যে শুধু এতটুকুই বুঝতে পারলো "রাজাকার রাজাকার। রাজাকার খুজছি।" ওরা তিন জনই ছিট্‌কে দূরে সরে গেল। স্তব্ধতা। তারপরই ওরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো -

ঃ আপনি মুক্তিযোদ্ধা ! - লোকটির কাঁধ ধরে জোরে নাড়া দিতে দিতে ওরা চিৎকার করে চলছে বলুন বলুন আপনি কি মুক্তিযোদ্ধা - মুক্তিযোদ্ধা - মুক্তিযোদ্ধা?

ঃ হ্যাঁ বাবা আমি মুক্তিযোদ্ধা। রাজাকার খুজছি - বলেই লোকটি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

এর পরের ঘটনাগুলি এতো দ্রুত ঘটে গেল যে বিশদ বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। ঢাকায় বুড়িয়াপ্পা পুলিশকে সব জানালেন। এক নিকট আত্মীয় আর্মিতে চাকুরী করেন তাকেও জানানো হলো। তিনি কক্সবাজারে খোঁজ নিলেন। কিন্তু ওরা কক্সবাজারের উল্টো দিকে খাগড়াছড়ি জেলার বেলছড়ি সীমান্তে চলে গেছে। তাই কোন হদিস পাওয়া গেল না। দুশ্চিন্তা গভীর হলো সবার মনে। আফিয়াদিতি জনমানবহীন এ গভীর জংগলে নাটকীয় ঘটনায় বিস্ময়াভুত হয়ে করনীয় কিছুই খুঁজে না পেয়ে তার পিঠে ঝুলানো কম্পিউটারটি নামিয়ে অন করলো। একটু পরই সে রেসকিউ ম্যাসেজ পাঠালো তার কম্পিউটারের অন লাইন কত অজানারে ওয়েব সাইটে। চোখে মুখে পানির ঝট্‌কা দিতেই ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এলো লোকটির। তিনজনে মিলে তাকে উঠে বসতে সাহায্য করলো। আস্তে আস্তে লোকটির জড়তা কেটে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন। দৃষ্টি প্রখর হল। ক্ষণিকবাদে পরিস্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন -

ঃ তোমরা কারা?
শত্রু না মিত্র?
পাকবাহিনী, রাজাকার না মুক্তিযোদ্ধা?

এতোগুলি প্রশ্ন করে লোকটি হাঁপাতে লাগলো। আর এক কাপ কফি খেয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে সে ওদের সহযোদ্ধা ভেবে মুক্তিযুদ্ধের খোঁজ খবর নিতে লাগলো। রণাঙ্গনে যেমনি ভাবে এক যোদ্ধা আরেক যোদ্ধার কাছে খবর নিত। মুক্তিযুদ্ধের ৩০ বছর পর রণাঙ্গন '৭১ এর খোঁজখবর এ ক্ষুদে পর্যটক দল কি করে তাঁকে দেবে। কোন সদোত্তর না পেয়ে লোকটি সন্দেহের চোখে তাকালো ওদের দিকে। ক্ষেপে গিয়ে জোরে চিৎকার করে বললো -

ঃ তোমরা নিশ্চয়ই রাজাকার। তা না হলে যুদ্ধের খবর বলছ না কেন?

ওরা অনেক কষ্টে তাকে নিয়ন্ত্রণে আনলো। ধীরে ধীরে বললো -

ঃ আংকেল ৩০ বছর আগে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। আপনি জিতেছেন। পাকিস্তানীরা পরাজিত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন স্বাধীন।

লোকটি বিহব্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর হাউ মাউ করে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারালো আবার।

জনাকীর্ণ প্রেস ক্লাব। সামনের মাঠটি ভরে গেছে অগনিত লোকে। হাই কোর্ট থেকে তোপখানা মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি বন্ধ। হাজার হাজার মানুষ এসেছে। একজন জীবিত মুক্তিযোদ্ধাকে দেখার জন্য। যে আজো পাহাড়ে পাহাড়ে জংগলে জংগলে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে রাইফেল হাতে।

৬ একুশ আমার মিছিলের মুখ জীবন্ত প্রত্যয়

কুয়াশার লেপ মুড়ি দিয়ে গমের ক্ষেতগুলি ঘুমাচ্ছে। পায়রা, পেঁয়াজ ও মশুরের ক্ষেতগুলি লেপ সরিয়ে উঁকি দিচ্ছে উদীয়মান দিনমনির দিকে। ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে চারিদিক। সবুজ দুর্বার অশ্রুকণা মাড়িয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে দু'টি পা। পা দু'টি খালি। কুয়াশার আঁচল উঠিয়ে পা দু'টি যখন এগুচ্ছে তখন সূর্যের উঁকি-ঝুঁকি দিগন্তের নিম্নসীমানায়। বাড়ীর সীমানা পেরিয়ে পা দু'টি যখন চকে পড়লো তখন বিশাল রবি ফসলের মাঠ জুড়ে দু'একটি কালো ফিংগের ইতিউতি উড়াউড়ি ছাড়া দৃষ্টি সীমানায় জনমনিষ্যি নেই। আড়াআড়ি পেঁয়াজের ক্ষেত পাড়ি দিয়ে পা দু'টির অধিকারীনী প্রায় চলে এসেছেন পাকা সড়কের চৌকাঠে। মাথায় ইষৎ ঘোমটার উপর একটি কাশ্মিরী শাল সযত্নে জড়িয়ে গুরালীর একটু উপরে শাড়ী তুলে তিনি পাকা রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। অল্প দূরে কুলু কুলু রবে বয়ে চলছে ধলেশ্বরীর কালো জল। এখানে এ নদীটির নাম কালিগঙ্গা। কালিগঙ্গা ব্যাইলার ঘুগ্‌রি ও কেচ্‌কি মাছের জন্য বিখ্যাত। মানিকগঞ্জ পার হয়ে নদীটি মিশেছে পদ্মায় - আরিচার কাছাকাছি এসে। অতি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শহীদ রফিকের নামে যে ব্রীজটির নামকরণের ঘোষণা দিয়েছেন সে ব্রীজটি এ নদীর উপর

মেয়েটি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। তার কোন তাড়া নেই। নেই বিরক্তির চিহ্ন কোন অভিব্যক্তিতে। অপার ধৈর্য্য ও শান্ত সমাহিত স্নিগ্ধ লাবণ্যে ভরা মুখটি। গাম্ভীর্য ও সরলতার সাথে নিরাভরণের অলংকার মিলেমিশে তাঁকে যে আভিজাত্যের অবয়ব দিয়েছে তাতে কারুর পক্ষেই অবজ্ঞা করে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কাস্তে হাতে যে দু/চারজন ক্ষেত মজুর বা বর্গাচাষী বা জমির মালিক সড়ক পেরিয়ে পেঁয়াজ ক্ষেতে নেমে যাচ্ছে তারা সবাই এক নজর দেখে মাথানত করে শ্রদ্ধা জানিয়ে নিড়ানীর কাজে ক্ষেতে ঢুকছে। খেজুর গাছের কাঁটাওয়ালা ডাল দিয়ে বেড়া দেয়া এ সমস্ত জমিতে পেঁয়াজ হয় প্রচুর। বাংলাদেশে যত পেঁয়াজ রসুন উৎপন্ন হয় তার এক চতুর্থাংশ হয় মানিকগঞ্জ জেলার এ সমস্ত এলাকায় এবং পদ্মার ওপারে জাজিরা থানায়। বছরের এ বিশেষ দিনটিতে এলাকার সবাই জানে তিনি আসবেন। এ পথ দিয়ে পাকা রাস্তায় উঠবেন। অপেক্ষায় থাকবেন। একটা রিকসা নিয়ে নদীর পাড়ে যাবেন। খেয়া পাড় হয়ে ওপারে অপেক্ষমান বেবী ট্যাক্সিতে উঠবেন। তারপর কোথায় যাবেন। তা অনেকে জানে, অনেকে জানে না। তবে এলাকার মুরব্বী যাঁরা আছেন বর্তমানে যাঁরা শুধু পান চিবুন আর হুক্কা টানেন আর অলস মুহুর্ত কাটান ওপারের ডাকের আশায়। তারা এদিনটির প্রতিক্ষায় থাকেন সারা বছর। কুয়াশার উর্নাভ জাল ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভেজা ঘাসের গন্ধ বুকে নিয়ে তিনি যখন খালি পায়ে কালো পেড়ে সাদা শাড়ী পরে আসেন। তখন ঐ বুড়ো হাড়গুলো যৌবনের মাতম শুরু হয়। নুয়ে পড়া মাথাটি সোজা হয়। ধনুকের মত বাঁকা শিরদাঁড়া টান টান হয়। একসময় শ্লেস্মামাখা মুখ থেকে জড়ানো জিহ্বা ভেদ করে বের হয় "নুরুল আমিনের কল্লা চাই / রাষ্ট ভাষা বাংলা চাই।" এ বাক্য যুগল শব্দ তরঙ্গে নাড়া দিয়ে নদীর কালো জলে ঢেউ তুলে হলুদ সরিষা ক্ষেত সবুজ পেয়াজের ডাঁটা, সোনালী গমের শিষ দুলিয়ে দিয়ে ভেসে যায় দিগন্তে। তখন তিনি মানিকগঞ্জ বাসষ্ট্যান্ড থেকে ঢাকাগামী বাসের জানালার ধারের একটি সিটে বসে তাকিয়ে থাকেন বাইরে অপসৃয়মান নিসর্গের দিকে।

বাসটি যথা সময়ে যথাস্থানে পৌছে। তিনি আর রিকসা নেন না। হেঁটে চলেন আজিমপুর গোরস্থানের দিকে। গাবতলী থেকে আজিমপুরের দুরত্ব অনেক। হেঁটে যাওয়া কষ্টকর। তাঁর বয়সী একজন মহিলার পক্ষে তো বটেই। কিন্তু তাঁর ক্লান্তি আসে না। যতো তিনি এগোন তত উৎসাহ বাড়ে। নানা বয়সী নানা রংয়ের কাপড় পড়া লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। সবারই গন্তব্য আজিমপুর গোরস্থান হয়ে শহীদ মিনার। তিনি হাঁটেন আর দেখেন। কখানো দেখা যায় দলবদ্ধ নরনারী, কখনো একটি পুরো পরিবার। কখনো বা একা একা একগুচ্ছ ফুল হাতে কেউ হেঁটে যাচ্ছেন আনমনে। সবকিছু ছাপিয়ে শুধু মিছিল আর মিছিল। প্রত্যয়ে দীপ্ত মিছিলের মুখগুলি তার বড় ভাল লাগে। তাঁর দুটি চোখ খুঁজতে থাকে একটি মুখ। যে মুখটি হারিয়ে গেছে তাঁর শৈশবে। ছোটকালে মায়ের হাত ধরে। বড় হয়ে একা একা। তারপর স্বামীর সাথে। তারপর ছেলেমেয়েদের সাথে নিয়ে। আজ আবার একা। "অবশেষে জেনেছি মানুষ একা"। আবুল হাসানের পংক্তিটি মনে পড়ে। হ্যাঁ একাই তো। বাবা তো একাই চলে গেলেন মাকে একা রেখে। আমাকে একা রেখে। ভাবনার সূঁতো ছিড়ে যায় কতগুলি কচিকণ্ঠের কলতানে। এক দংগল শিশু স্কুল ড্রেস পড়ে শহীদ মিনারে যাচ্ছে

শিক্ষকদের সাথে। তিনি নিজেও একজন শিক্ষক। স্বামী ও শিক্ষক ছিলেন। স্বামী শুধু স্কুলেরই শিক্ষক নন। বাড়ীতে তাঁর ও শিক্ষক ছিলেন। স্বামীর উৎসাহ ও অভিভাবকত্বেই তিনি বি.এ. পাশ করতে পেরেছেন। তারপর স্কুলের চাকুরী। পরে বি.এড. ডিগ্রী লাভ। আজ যে বালিকা বিদ্যালয়টির তিনি প্রধান শিক্ষক। সে তার স্বামীর দান নিজের সততা ও কর্ম প্রচেষ্টার ফল। তিনি ভাবতে চাননা এসব। তবু ভাবনারা ঘিরে ধরে। মিছিলের মুখগুলি যেমন চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে তাকে। আচ্ছা ওরা কি জানে আমার পরিচয়। শহীদ বরকতের মাকে কত সম্মান দেয়া হলো। খালাম্মাকে যেদিন শহীদ মিনারে হাত ধরে নিয়ে যাওয়া হলো দূর থেকে আমি তাকে দেখেছি। সাহস করে নিজের পরিচয় দিতে পারি নাই। শহীদ রফিকুর রহমানের একমাত্র সন্তান। এটা কি আমাকে চিৎকার করে বলতে হবে সবাইকে। বাবা তো কোন লোভে শহীদ হননি। বাবা শহীদ হয়েছেন মাতৃভাষার জন্য। আজ ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাবার নাম শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা পৃথিবীতে উচ্চারিত হবে, ছড়িয়ে পরবে। কি প্রয়োজন নিজের পরিচয় দিয়ে। সবাই আমাকে চিনুক, আমি রফিকের মেয়ে। আমাকে আদর করুক, সম্মান দিক, শ্রদ্ধা জানাক - আরো কত কি। ছিঃ না না না। "আপা কিছু বলছেন"। মিছিলের একটি মুখ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো তাঁকে। সম্বিত পেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে তিনি বলে উঠলেন "না না বাবা কিছু না। তুমি এগিয়ে যাও"। ভাবনার খেঁই হারিয়ে বাস্তবে ফিরে এসে দেখেন পুরো আজিমপুর এলাকাটা জনারণ্যে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় গোরস্থানে ঢোকাটা দুরূহ। তাঁকে ঢুকতেই হবে। সাতচল্লিশ বছরের নিয়মের ব্যাতয় হতে পারে না। তিনি ধীর পায়ে এগিয়ে যান গোরস্থানের দিকে।

বেলা বাড়ছে, রৌদ্রের তেজও বাড়ছে। হাতে ধরা সযত্নে লুকিয়ে রাখা ফুলগুলির কথা এতোক্ষণে তাঁর মনে পড়ে। দুটি তোড়া ছিল। একটি কোথায়? একটি যে বাবার কবরে দিয়ে এসেছে সে কথা ভুলেই গিয়েছেন। "আচ্ছা কি হয়েছে আজ আমার"। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেন। "এতো ভুল হচ্ছে কেন আজ?" বিড়বিড় করে কথা বলেন নিজের সাথে। সেদিন ও কি সূর্য্যের তেজ এমনি ছিল। ১০ জন ১০ জনের এক একটি গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসছে ১৪৪ ধারা ভংগ করে। মোঃ সুলতান গেটে দাঁড়িয়ে তাঁর নোট বুকে সবার নাম লিখে রাখছেন। ১ম গ্রুপটি বেরিয়ে গেল হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে। মেধাবী ছাত্র হাবিবুর রহমান বেরিয়ে যাওয়ার সময় সুলতানকে বলে গেলেন "দোস্ত আমার পংখীরাজটাকে (সাইকেল) দেখিস, আমি চল্লাম।" ছাত্রীদের দলটি শাফিয়া খাতুনের নেতৃত্বে বেরিয়ে গেল। এমনি করে শেষ দলটি বেরিয়ে যাওয়ার পরই গুলির শব্দ মেডিক্যাল ব্যারাকের কাছ থেকে। ছুটে গেলেন সবাই। বরকতকে ধরাধরি করে ইমার্জেন্সীতে নেওয়া হলো। ডাক্তাররা ঘোষণা করলেন মৃত। মেডিক্যালের বারান্দায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন রাষ্ট্রভাষা মতিন। দুহাতে মুখ ঢেকে শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন তিনি। "আচ্ছা বাবা তো ছাত্র ছিলেন না। ছিলেন হাইকোর্টের একজন কর্মচারী তাহলে বাবা কেন শহীদ হলেন?" শুধান নিজেকে। বাতাসের আগে পৌঁছে গেল খবর ঢাকার অলিতে গলিতে। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা-মক্তব, মসজিদ-গীর্জা-মন্দির থেকে, রান্নাঘর। আরাম আয়াশ থেকে বেরিয়ে এলো জনগন ঢাকার রাস্তায়। "নুরুল আমিনের কল্লা চাই / রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই / শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।" বলতে বলতে সামনে এগিয়ে আসলেন তেজী যুবক রফিক। বোতাম খোলা সাদা শার্টের ঘন কালো লোমে ভরা বুকটি এগিয়ে দিলেন গুলির সামনে। পর পর দুটি আওয়াজ হলো। ঢলে পড়লেন রফিক। পরপর শহীদ হলেন সালাম, জব্বার। ২২শে ফেব্রুয়ারী শহীদ হলেন শফিক ও ১২ বছরের সেই নাম না জানা বালক নবাবপুর রোডের গলির ভেতর। আরো কত নাম না জানা। কে তার হিসাব রাখে। "আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী / আমি কি ভুলিতে পারি, আমি কি ভুলিতে পারি।" চারিদিক থেকে ভেসে আসছে বেদনা গভীর সুরের মুর্ছানা। আমি কি ভুলিতে পারি, আমি কি ভুলিতে পারি। "বাবা ভুলিনি আমি, ভুলেননি আমার মা। ভুলবেনা আমার সন্তানেরা।" বলতে বলতে এগিয়ে আসেন তিনি। এবারের চলা দৃপ্ত। ধীর অথচ শক্ত। শহীদ মিনার যতই কাছে আসছে ভীড় ও ততই বাড়ছে। বছর ধরে মমতায় তিনি বড় করেন ফুলের চারাগুলি, গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা আরো কতো কি। শুধু এই একটি দিনের জন্য। সারা বছরের অতি মমতায় পরিশ্রমে গড়া ফুলের বাগান উজার করে ফুল নিয়ে আসতে মন চেয়েছিল তাঁর। মানিকগঞ্জের সেই অজ পাঁড়াগা থেকে ঢাকার শহীদ মিনার পর্যন্ত অতো ফুল বয়ে আনার শারিরীক সামর্থ আজ আর তাঁর নেই। তাই সারারাত জেগে অতি যত্নে দুটি তোড়া তিনি বানিয়েছেন। একটি দিয়েছেন আজিমপুর গোরস্থানে। আর একটি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন শহীদবেদীর দিকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করছে। শহীদ মিনারকে সামনে রেখে ডান দিক ঘুরে লাইন ধরে সবাই এগিয়ে আসছে। ব্যানার দেখে নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। "জেদ্দা বঙ্গবন্ধু

পরিষদের” নাম ঘোষণা করতে গিয়ে ঘোষক অবাক হলেন। খুশীতে উপচে পড়া গলায় ঘোষক ব্যানারে লেখা নামটি ঘোষণা করলেন বার বার। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সবাই। খালি পা, হাতে ফুল, চোখে অশ্রু টলমল করছে। তাঁকে দেখে হয়তো শ্রদ্ধায়, বয়স্কা ভেবে হয়তো করুণায় বিগলিত হয়ে পথ করে দিলেন স্বেচ্ছাসেবকরা। শ্রদ্ধাবনতচিত্তে অতিযত্নে ফুলের তোড়াটি তিনি শহীদ মিনারের বেদীতে রাখলেন। শহীদ মিনার। যেন মায়ের বরাভয় নিয়ে ইষৎ নত হয়ে দু-হাতে আগলে রেখেছেন সন্তানদের। “বাবা। আমি আসবো। প্রতি বছর। যতদিন জীবিত আছি ততদিন। এপর প্রকৃতি আসবে। আমার জেষ্ঠ্যা কন্যা, তোমার নাতনী। তারপর তাঁর জেষ্ঠ্য পুত্র জয়। তোমার উত্তর পুরুষ। এরপর তাঁর সন্তান। জন্ম জন্মান্তরে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। আমরা আসবো বাবা।” বাঁদিকে ঘুরে তিনি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন। ঘর্মাক্ত মুখটি মুছলেন আঁচল দিয়ে। আকাশের দিকে তাকালেন। এখন কটা বাজে। ঘড়ির কথা মনে পড়লোনা। পড়ন্ত দুপুরে তিনি বসে পড়লেন দুর্বা ঢাকা শহীদ মিনারের চত্বরে। এতোক্ষণে মনে পড়লো ক্ষুধা লেগেছে। সারাদিন তিনি কিছু খাননি। কি খাবেন, খিরা, বাদাম, চানাচুর না কি কোন হোটেল থেকে ভাত। অনেক আত্মীয় আছেন ঢাকায়। কারো বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না। নুন মরিচ মাখা ১ প্লেট খিরা নিয়ে তিনি ভাবছেন প্রকৃতি এখন কি করছে? জয় কি কথা বলতে পারে? আজ একুশে ফেব্রুয়ারী। একথা কি প্রকৃতির মনে আছে। কিংবা পৃথিবীর? খিরার প্লেট টা শেষ করে তিনি উঠলেন। এখনো দ্রুত পা চালালে মানিকগঞ্জের শেষ বাসটা ধরতে পারবেন।

২

পাঁচটা গাড়ী একসাথে মদীনা থেকে জেদ্দার পথে। পড়ন্ত বিকালের বিদায়ী সূর্য পাহাড়ের পিছনে নেমে আসছে। কালো পাহাড় ডুবন্ত সূর্য্যের রক্তিমাভায় সবুজ বর্ণের রং মেখেছে। পাঁচটি গাড়ীতে পাঁচটি পরিবার। পৃথিবীর গাড়ী সবার আগে। ওরা জেদ্দা-মদীনা হাইওয়ে বাদ দিয়ে পুরানো রাস্তা ধরেছে। যেটি বদর হয়ে আসে। বদরের কাছে আসতেই পিছনের হ্যাজার্ড জ্বালিয়ে গাড়ী থামাবার ইংগিত করে পৃথিবী হাইওয়ে থেকে নেমে ডান দিকে গাড়ী সাইড করলো। পিছনের চারটি গাড়ী সারিবেঁধে থেমে গল পর পর। গাড়ী থেকে নেমে সবাই এগিয়ে গেল পৃথিবীর কাছে। চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। “কি হয়েছে?” সমস্বরে প্রশ্ন করলো সবাই। পৃথিবী বললো “প্রকৃতি কাঁদছে।” সবাই ঘিরে ধরলো প্রকৃতিকে। “আজ কত তারিখ?” মাথা নীচু রেখেই প্রকৃতি প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল সবার দিকে। সবাই বলে উঠলো “একুশে ফেব্রুয়ারী।” “তাই তো!” হুস ফিরে এলো সবার। “এখন বাজে পাঁচটা আমরা কনসুলেটের প্রোগ্রাম পাব না।” বললো খোকা। “চলো আমরা সামনের খেজুর বাগানে যাই। ওখানেই পালন করবো এবারের একুশে ফেব্রুয়ারী।” প্রস্তাব রাখলো কাজী আমিন। এক বাক্যে সবাই কাজী আমিনের প্রস্তাব মেনে নিয়ে ঢালু বেয়ে এগিয়ে গেল সামনের বাগানের দিকে। সবুজ দুর্বার গালিচায় গোল হয়ে বসলো সবাই। “প্রকৃতি তুমি ফেরার পথে পুরানো রোডে আসতে বলেছিলে কেন?” মুরাদের জিজ্ঞাসা। “হয়তো এ খেজুর বাগানটা ওর একুশ উদযাপনের জন্য উপযুক্ত মনে হয়েছিল।” মন্তব্য মাসুদের। সবাইকে থামিয়ে কাজী আমিন বললো, “তোমার কান্নার কারণটি কিন্তু এখনো বলনি প্রকৃতি।” চোখ মুছে মাথা তুললো প্রকৃতি। দেখলো সবকটি চোখ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। এমনকি ছোট শিশুরা পর্যন্ত। সবার দিকে নজর বুলিয়ে নিজেকে সংযত করলো প্রকৃতি। ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে প্রকৃতি বলতে শুরু করলো। “তোমরা শুধু আমাকেই চেনো। আমার বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী কাউকে চেনো না। আমরা কেউই কারো পারিবারিক খবর রাখি না। এই জেদ্দায়ই আমাদের পারস্পারিক জানাশোনা, পরিচয়, ঘনিষ্টতা এবং বন্ধুত্ব। আজ এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে সুখে দুঃখে একে অপরের সাথী। আমরা যেন সবাই একটি পরিবার।” এতটুকু বলে একটু থামলো প্রকৃতি। সবাই ওর দিকে উৎসুক তাকিয়ে আছে। প্রকৃতি আবার শুরু করলো। “আমি বায়ান্নর শহীদ পরিবারের মেয়ে। ভাষা শহীদ রফিক আমার নানা ..... ।” প্রকৃতি যখন থামলো সবার চোখে তখন পানি। চোখের জল লুকোবার চেষ্টা কেউ করলো না। নীরবতা ভঙ্গ করে পৃথিবী তাড়া দিল সবাইকে। “আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী / আমি কি ভুলিতে পারি।” মৃদু সুর। আস্তে আস্তে সপ্তমে উঠলো। গলা ছেড়ে গাইতে গাইতে এগিয়ে গেল সবাই গাড়ীর দিকে। গাড়ীতে বসে সমস্বরে সবাই বলে উঠলো “একুশ আমার মিছিলের মুখ জীবন্ত প্রত্যয়।” এ প্রত্যয় বুকে নিয়ে পাঁচটি গাড়ী ষ্টার্ট দিল। বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি প্রজন্ম এগিয়ে চললো একুশের পথ ধরে।

৭ মিলার ক্ষয়ে যাওয়া

মিলার বুকের পুরো মাংসের তলায় বাসা বেঁধেছে মরণপাখি। মৈথুনের চরম মুহূর্তে তার উথাল পাতাল পাছার বাড়িতে কামড় দেয় সেই মরণপাখি। মিলার রাঙ্গা ঠোঁটের ফাঁকে সুখ উঁকি দেয় না। পতনতৃপ্ত প্রচন্ড উল্লাস পাখির বুকের দাপাদাপিতে মিলিয়ে যায়। তার বুকের বাসায় পোষা মরণপাখি তাকে ঘুমোতে দেয় না। স্বস্তি দেয় না। শান্তি দেয় না। তার সুখ কেড়ে নিয়েছে তার আহ্লাদের সুখপাখি। বুকের নীচে বাম দিকের গোপন খাঁচায় ঘুমিয়ে আছে মরণপাখি।

"পাখি তুই বাইরে আয়না।

পাখি তুই উড়াল দে না।"

মিলার শত কান্নাকাটি, কাকুতি মিনতি, মাথা ঠুকাঠুকিতে কান দেয় না লোভী পাখি। পাখি ডিম পাড়ে। তা দেয়। বাচ্চা ফুটায়। মিলার বুকের ভিতর কিচির মিচির করে। মিলার ফোলা গালের রক্তাভা কালো হয়। মিলার মুখ গহ্বরে আলাজিভে রক্ত লাগে। পাখির নখরের রক্ত লাগে। মিলার রক্ত বিশুদ্ধ নয়। রক্তে মিশে আছে সাদা চর্বি। চর্বি জমে ব্যরিকেট বানায়। মিলার সুপুষ্ট বুক হাঁস ফাঁস করে। তার স্তনভারে নুয়েপড়া বুকের কার্ণিশে পাখি সুখে শিষ দেয়। তার পাছার আটো ভাগে পাখি হাগো করে। মিলার শরীর নষ্ট হয়। নষ্ট হতে হতে দগ্ধ হয়। মিলা দেখে কি করে তার সাধের শরীর ক্ষয় হয়। মিলার শরীরের আগুন নিভতে থাকে। কোন টাকমাথা কাকলাসও তার অনাহারী চোখ তুলে ধরে না মিলার দিকে। মিলার বুকের নীচে বামদিকে, আঠাল চর্বিযুক্ত মাংসের তলায় বাসা বেধেছে মরণপাখি। মিলা নিভতে নিভতে জ্বলতে চায়, দেশলাইয়ের জিয়নকাঠি কোথাও খোঁজে পায় না। মিলা বাঁচতে চায়। পাখির ঠোঁটে তার জীবন। জীবন খাদ্য হয়ে ঝুলে থাকে। মিলা চিৎকার করতে চায়। পাখির ঠোঁট, তার চিৎকার ট্রান্সপারেন্ট টেপবদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখে। পাখিরে মিলার একলা পাখি। উড়েনা, ঘুরে না, উঠেও না। ঠায় বসে রয়।

মিলা তার কৈশোরের কামিনী গাছটির পাশে যেতে চায়। মিলা তার ডুবে যাওয়া ছোট ফুফুর আঁচল ধরে বাঁচতে চায়। মিলা শীতের ভোরের গলিত কনকের ভেতর তার ঝুমুর ঝুমুর ঘুংঘুর বাজিয়ে খেজুরের রস খেতে পালানের দিকে দৌঁড় দিতে চায়। সাত সকালে পাখি এসে সামনে দাঁড়ায়। মিলা কোথাও যেতে পারে না। মিলা বসতে পারে না। উঠতে পারে না। হাটতে পারে না। ঘুমোতে পারে না। মিলা তার প্রাণের দোসর জীবনের বুকে মুখ ঘষতে পারে না। সে তার জ্বালা জুড়াবার ঔষধ কোথাও খুঁজে পায় না। জীবন তার হাতের ছোঁয়ায় মিলার জীবনফুল ফুটাতে পারে না।

না সংগমে

না সংসারে

না বনে

না বাজারে।

মিলার শূণ্য বুকের মাংসের তলায় ভাঁজকরা খড়কুটায় পাখি বাসা বেঁধেছে। পাখি রাঁধে বাড়ে খায়। পাখি কথা বলে কিচির মিচির। সন্তান সন্ততির চঞ্চুতে চুমু দেয়। মিলা বিক্ষত হয়, মিলা ক্ষয়ে যায়। ক্রমশ হলুদ মৃত্যু মিলাকে নীলের দিকে নিয়ে যায়। মিলার আকাশ ছোট হয়ে আসে। মিলার বাতাস সংকুচিত হয়ে আসে। মিলার ফুলের বোটা শুকোতে থাকে। জীবন চেয়ে দেখে। তার নিষ্প্রাণ চোখ থরো থরো ওষ্ঠাধার মিলা থেকে দূরে নিয়ে যায় ক্রমশ। মিলা সব দেখে সব বুঝে। চোখ বুজলেই মরণপাখি ইশারা দেয়। মিলার বুকের মাঝে ছোট্ট বাসায় মরণপাখি নাচানাচি করে। মিলা চুরমার হয়। ভাংতে ভাংতে দাঁড়াতে চায়। তার বিপুল উরু, সুগঠিত নিতম্ব, তীক্ষ্ণ নখাগ্র সব খামচে ধরতে চায় পাখিকে। পাখি পিছু হটে, সামনে এগোয়, ডাইনে যায়, বায়ে যায়। কিন্তু উড়ে না। পাখি ডানা ঝাপটায়, তার চঞ্চুতে মিলার ঠোট মিলাতে চায়। মিলার লিপষ্টিক মুঝে যায়। অশ্রু তার কাজল ধুয়ে কাজল নদী বানায়। মিলা ধুকতে থাকে, মিলা মরতে থাকে।

কিন্তু মরে না।

মিলা বাঁচতে চায়।

কিন্তু বাঁচে না।
মিলা পালাতে চায়।
কিন্তু পারে না।
মিলা তাড়াতে চায়।
কিন্তু হাত উঠে না।

মিলা নিঃশেষ হয় কিন্তু নিঃশেষিত নয়। মিলা নিষ্পেষিত হয় কিন্তু পিষ্ট নয়। মিলা সব হারায় কিছুই পায় না। তবু হারিয়েও হারায় না। মিলা থেকেও নেই। মিলা বেঁচেও বাঁচে না। মিলার বুকের পোষা পাখি যত্নে লালিত হয়। স্বপ্নভ্রষ্ঠ হয়। দুঃস্বপ্নের বিশাল ডানা মেলে মরণপাখি ছোঁবল দেয়। মিলা আর মিলা থাকে না। তার অস্তিত্ব প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। তার বিপুল চুল ধুলায় লুটায়। তার ছন্দায়িত দেহ কলাগাছ হয়ে বাঁশঝারের তলায় শুয়ে থাকে। তবু মিলা মরে না। তার গোপন কন্দরের মরণপাখি ডাক দেয়। তার মরণ ডাকে মিলা নড়েচড়েও না, চোখ মেলে তাকায়ও না। তার জঙ্গা ভিজে যায়। গোপন নদী শুকিয়ে যায়। তার অরণ্য জংলী ফুলে ভরে যায়। গন্ধমাদনের ফুল ধীরে ধীরে পাপড়ী মেলে দুর্গন্ধ ছড়ায়। মিলার বুকের তলায় বিষপাখি তার রক্তের হিমোগ্লোবিন চুষে খায়। তার বোনমেরুজে এইডসের পোনা কিলবিল করে। কোলেষ্টরলের আঠালো রস তার জীবন রস বিষাক্ত করে। মিলা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায়। সে ঝি ঝি-র ডাক শুনতে চায়। সে মধ্য দুপুরে কলসী কাখে শাক তুলতে যেতে চায়। পুকুরের কালো জলে সে ডুব সাঁতার দিতে চায়। সে যা চায় তা পায় না। বুকের নীচের মরণপাখি তার ইচ্ছাগুলি ঠুকরে খায়। মিলা নিঃসাড় পড়ে থাকে। তার ঠান্ডাঘরের নরম বিছানা তাকে ডাকে। সে উঠতে পারে না। সুখ তাকে ডাকে, জীবন দু'বাহু বাড়িয়ে দেয়। বৈভব তাকে ইশারা করে। বাঁশতলা তাকে ছাড়ে না। মরণপাখি তাকে পাহাড়া দেয়। বুকের ভিতর পোষে রাখা মরণপাখি মিলাকে মৃত্যুও দেয় না। জীবনও দেয় না। মিলাকে মিলা হতে দেয় না।

দেয় না।
দেয় না ।।
দেয় না ।।।
তাকে কিছুই দেয় না।
ফুল না
সুর না
আকাশ না।
সবুজ না
আনন্দ না
উল্লাস না
রমন না
রমনীয় শোভনও না।

মিলাকে কিছুই দেয় না। মরণপাখি বাসা বানায়। ডিম পাড়ে। তা দেয়। বাচ্চা ফুটায়। বাচ্চাদের আদর করে। ঘুম পাড়ায়। কিচির মিচির গান শুনায়। মিলা অসাড় পড়ে থাকে বাঁশ তলায়।

থাকে শুধু শূণ্যতার হাহাকার
জীবন জুড়ে শুধুই মিলার
জীবন নষ্টের হাহাকার ॥

সম্পাদক দেওয়ান আবদুল বাসেত এর অন্যান্য প্রকাশিত মৌলিক গ্রন্থ

(প্রকাশিত অধিকাংশ গ্রন্থই এখন ওয়েব সাইটে রয়েছে)

ছড়াগ্রন্থঃ

	প্রকাশকাল
(১) কিচির মিচির	১৯৮৯, ১৯৯৭, ২০০২ ইং
(২) ভোরের শিশির	১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০,২০০২ ইং
(৩) বৃষ্টিকে চিঠি	১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০২ ইং
(৪) লড়াই	১৯৯৭,১৯৯৯,২০০১,২০০২ ইং
(৫) দেশ-জনতার ছড়া	২০০১, ২০০২ ইং
(৬) পাখির রাজা ফিঙে	২০০০, ২০০১, ২০০২ ইং
(৭) ভাল্লাগে না (কিশোর কবিতা)	২০০০,২০০২ ইং

কাব্যগ্রন্থঃ

(এক) তুমি এলে তাই বৃষ্টি এলো ২০০১,২০০২ইং

(দুই) গেরিলা প্রেমের পদধ্বণি ১৯৯৯, ২০০২ইং

গল্প গ্রন্থঃ

(১)	রেজিয়াদের উপাখ্যান	১৯৯৫, ১৯৯৭, ১৯৯৯ইং
(২)	কেমন আছো	২০০১ ইং
(৩)	কাচ ভাঙ্গার শব্দ	১৯৯৯, ২০০২ইং
(৪)	প্রেম অনলে	১৯৮২ইং

শিশু ও কিশোর উপযোগী অনুবাদ গল্পগ্রন্থ ঃ

পাপ্পা মাম্মা এন্ড বেবী বিয়ার

প্রথম প্রকাশঃ ২০০২ অমর একুশে বইমেলা

ইন্টারনেট এডিশন- ডিসেম্বর ২০০২

আমাদের ওয়েব সাইটের ঠিকানাঃ

www.geocities.com/newshipon

তোমার হলো শুরু আমার হলো সারা ... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর